ভাবাবেগ দ্বারা আক্রান্ত হয়েছিলেন। সীতারামের ব্যর্থতার মূলে ছিল তাঁর অদম্য হৃদয়াবেগ ও প্রেমে ব্যর্থতাবোধ। শুভসিংহের আত্মহত্যার মূলে সে ধরণের ইঙ্গিতটুকু স্পষ্ট হলে দর্শকরা যুক্তি খুঁজে পেতেন।

'স্বপ্নময়ী নাটকের' সর্বাপেক্ষা অবাস্তব চরিত্রটিই স্বপ্নময়ীর। নাটকের শুরু থেকেই এই চরিত্রটির আচরণ এতই অস্বাভাবিক যে গুরুত্বপূর্ণ কোনো মুহূর্তে এই চরিত্রটির আবির্ভাবের হেতু খুঁজে পাওয়া যায় না। অথচ নায়ক শুভসিংহ এই অপরিণতমনা—ছায়াচ্ছন্না নারীকে স্বদেশপ্রেমে দীক্ষা দিয়েছিলেন। ছদ্মবেশী যুবককে স্বপ্নময়ী দেবতা বলেই বিশ্বাস করে এসেছে,—শুভসিংহ সেই সুযোগেই স্বপ্নময়ীকে দেশচেতনায় দীক্ষিত করলেন। কিন্তু নাটকের কোনো ঘটনা ও জটিলতায় স্বপ্নময়ী অংশগ্রহণ করেনি,—এ চরিত্র সম্পর্কে নাট্যকারের সঠিক বক্তব্য যে কী ছিল নাটকে তা খুঁজে পাওয়া যায়নি।

স্বপ্নময়ী চরিত্রের ঐতিহাসিক ভিত্তি নাট্যকার গ্রহণ করেননি। কিন্তু ইতিহাসে বর্দ্ধমান রাজকন্যার প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব ও নির্ভীকতার সংবাদটি পরিবেশিত হয়েছে। ইতিহাসে যে ঘটনা মিলছে,—

"At Burdwan in making an attempt upon the honour of Raja Krishna Ram's daughter, Shova Singh was stabbed to death by that heroic girl. who next plunged the dagger into her own heart". [History of Bengal Vol—II P—394]

এই ঘটনাকেই নাটকীয়রূপে পরিবেশনের যথেষ্ট সুযোগ ছিল ; নাট্যকারের আদর্শ ইতিহাসের সত্যকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠেনি বলেই এ চরিত্রটির ঐতিহাসিক ব্যক্তিত্বও এ নাটকে অবলুপ্ত। শুভসিংহ চরিত্রের পরিবর্তনটি আমূল নয় বলে শুভসিংহের দেশভাবনা একটি উজ্জ্বল আদর্শ সঞ্চার করেছে এ নাটকে, কিন্তু স্বপ্নময়ী প্রায় ছায়াময়ী হয়ে উঠেছে। স্বদেশপ্রেমের আদর্শ তার চরিত্রের গভীরে প্রতিফলিত হয়নি বলেই ব্যক্তিত্ব ও বৈশিষ্ট্য হারিয়েছে চরিত্রটি।

এ নাটকেই জ্যোতিরিন্দ্রনাথ দেশোদ্ধারের পরিকল্পনায় সমবেত চেষ্টার প্রয়োজনীয়তাটি উল্লেখ করেছেন। চিতুয়াবর্দার তালুকদারের পক্ষে একক চেষ্টায় কিছু করাই সম্ভব ছিল না, এই কারণেই পাঠান সর্দার রহিম খানের সাহায্য নিতে হয়েছে তাকে। রহিম খানও মোঘলবিদ্বেষী, উদ্দেশ্যের অভিন্নতাই এই দুই পৃথক শক্তিকে একত্রিত করেছিল। কিন্তু রহিম খানের ধূর্ততা নাট্যকারের দৃষ্টি এড়ায়নি। এমন অবস্থায় স্বীয় স্বার্থসিদ্ধির চিন্তাটিও যে গোপন থাকে না, – নাট্যকার সে বিষয়ে সচেতন করেছেন। তবে শুভসিংহের দেশোদ্ধারের সহায়তায় রহিম খান ও জোহনা

যুক্তভাবে সাহায্য করেছে। অন্যদিকে বিশ্বস্ত অনুচর সুরজমল নানা পরামর্শ দিয়ে শুভসিংহের দেশোদ্ধার পরিকল্পনাকে বাস্তব রূপদানের চেষ্টা করেছে। অন্যান্য নাটকে যে সমস্যা শুধু একটি দেশের বা গোষ্ঠীর,—'স্বপ্নময়ী নাটকে' সেটি একাধিক শক্তিকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে। এতে হিন্দু তালুকদার ও পাঠান সর্দার সম্মিলিতভাবে উদ্দেশ্যসাধনের ব্রত নিয়েছে। এদিক থেকে নাট্যকার যে ভবিষ্যৎ দেশোদ্ধার প্রচেষ্টায় আভাস দিয়েছিলেন—তাতে সন্দেহ কোথায়? দেশপ্রেম সেযুগে শুধু ভাবাদর্শমাত্র ছিল না—তার বাস্তবভিত্তিও স্থাপনের চেষ্টা চলছে দেশব্যাপী, এমন মুহূর্তে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ সেই আদর্শ প্রচারেরই চেষ্টা করে গেছেন। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ স্বদেশচেতনাকে নাটকের প্রাণমূলে সঞ্চারিত করে বাংলা নাট্য-সাহিত্যে একটি স্বতন্ত্র ধারার প্রবর্তন করলেন—নাট্যসাহিত্যের এই পর্বের উল্লেখযোগ্য নাট্যকারও তিনি। সমসাময়িক যুগচেতনার প্রভাবে এমন ভাবে প্রভাবিত হতে পেরেছিলেন বলেই তিনি সে যুগীয় বক্তব্যকে ইতিহাসের আধারে স্থাপন করে নাট্যরস সৃষ্টির অনলস সাধনা করেছিলেন। অথচ মৌলিক নাটক রচনার সত্যিকারের ক্ষমতা যে তাঁর ছিল,—ঐতিহাসাশ্রিত অথচ কাল্পনিক কাহিনীসর্বস্ব নাটকগুলিই তার প্রমাণ। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ কাহিনীর জটিলতা ও নাটকের অন্তর্দ্বন্দ্ব সৃজন মুহূর্তে তাঁর উদ্দেশ্য বিস্মৃত হননি,—দেশপ্রেমের বক্তব্য সেখানেও স্থান পেয়েছে। তার মৌলিক নাটক ছাড়া অন্যত্র এ চেষ্টা দেখি না। অগণিত নাটক অনুবাদ করার আশ্চর্য ধৈর্য তাঁর মধ্যে লক্ষ্য করা যায়,—যা মৌলিক সৃষ্টির পর্যায়ে পড়বে না কোনদিনই। কিন্তু যে চারটি নাটকে নাট্যকারের প্রতিভার সাক্ষাৎ পাই জ্যোতিরিন্দ্রনাথ সেখানে আদর্শ প্রচারে উন্মুখ। এই স্বাদেশিকতামন্ত্র তাঁর জীবনসাধনার বাণী। এই পবিত্র উপলব্ধি প্রচারে কোন দ্বিধা থাকার কথা নয়। দেশসাধনার স্বপ্ন তাঁকে আচ্ছন্ন করেনি, আলোকিত করেছিল তাই দেশপ্রেমের বাণী আমাদের কানে পৌঁছে দেবার আগ্রহ তাঁকে সৃজনধর্মী নাটক রচনার প্রেরণা দিয়েছিল।

তাঁর প্রতিভার পূর্ণ পরিচয় এই চারটি নাটকে ধরা পড়েছিল। কিন্তু নাটকগুলির কাহিনী নির্বাচন, চরিত্র কল্পনা ও নাটকীয়তা সৃজনের আলোচনা থেকে এ সত্য স্পষ্ট হয় যে নাট্যকার সমসাময়িক দেশোপলব্ধির বাণী প্রচারের চেষ্টা করলেও সে যুগের সামাজিক ঘটনা ও পরিবেশ থেকে কাহিনী ও চরিত্র নির্বাচন করেন নি। রোম্যান্টিক কল্পনার আত্যন্তিকতা ও অতীত ইতিহাসের আবছা আলোয় স্বপ্ন রচনার চেষ্টাটি তাঁর সবকটি নাটকেই ধরা পড়েছে। প্রহসন রচনার ক্ষেত্রে তিনি সমকালীন সমাজচিত্র অবলম্বন করেছেন—অথচ স্বদেশপ্রেমসর্বস্ব নাটকগুলির পরিবেশ নির্বাচনে

ইতিহাসের নিশ্চিন্ত আশ্রয় কামনা করেছেন বার বার। সম্ভবতঃ আদর্শের গাম্ভীর্য ও শুদ্ধতা বজায় রাখারও একটা অভ্যস্ত পথ বলেই ধরে নিয়েছিলেন তিনি। ইতিপূর্বে যে দু'একটি নাটকে দেশপ্রেমকথা স্থান পেয়েছে সেখানেও সমসাময়িক পরিবেশ থেকে পলায়ন করার একটা সহজ প্রবণতা নাট্যকারগোষ্ঠীর মধ্যে দেখা যায়। দেশপ্রেমের অনুভূতিকে একটা বিশ্বাসযোগ্য ভিত্তির ওপর স্থাপন করতে পারলেই এঁরা যেন বেশী আশ্বস্ত হন। অথচ নিতান্ত বাস্তবে একটি নিখুঁত আদর্শবাদী চরিত্র কল্পনা করার নানা অসুবিধা রয়েছে। দেশপ্রেমের সুগভীর ব্যঞ্জনা অতি বাস্তবের সত্যতায় যাচাই করতে গেলে অনেক ত্রুটি-বিচ্যুতি ধরা পড়বে সহজেই। তাই এঁরা সাময়িক উত্তেজনায় কম্পিত হৃদয়াবেগ অতীতের আধারে স্থাপন করতে চেয়েছেন। তার প্রথম মৌলিক নাটকের ঐলবিলা চরিত্রটির কথা স্মরণ করা যায় এ ব্যাপারে। ইতিহাসে এ চরিত্র কোথায়? শক্তিময়ী, ব্যক্তিত্বময়ী স্বাধীনচেতা এ নারীচরিত্রটি জ্যোতিরিন্দ্রনাথের স্বপ্ননায়িকা। নাট্যকারের কল্পনায় এই নায়িকার আবির্ভাব যেমন অভিনব তেমনি অপরূপ। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ নারী ও পুরুষের সম্মিলিত দেশসাধনার স্বপ্ন দেখতেন, 'স্বপ্নময়ী নাটকেও' এ বক্তব্য স্থান পেয়েছে। ভবিষ্যতের স্বাধীনতা আন্দোলনের স্বপ্ন দেখেছিলেন নাট্যকার এঁদের মাধ্যমে। কিন্তু সে যুগের সমাজে এমন কাহিনী তিনি কি খুঁজে পাননি যা নিয়ে একটি দেশাত্ম-বোধক নাটক লেখা সম্ভব? এ প্রসঙ্গটি জ্যোতিরিন্দ্রনাথের ইতিহাসপ্রীতির যুক্তি দিয়েও বোধকরি খণ্ডন করা যায় না। দেশপ্রেম সেযুগীয় চিন্তাধারায় স্থান পেয়েছে বটে কিন্তু আমাদের সমাজে তেমন কোন ঘটনা বা আন্দোলন গড়ে ওঠেনি বলেই নাট্যকারের দ্বিধা ঘোচেনি। এ ধরণের নাটকের অভিনয়েও অভাবিত সাফল্যও দেখা গেছে। জ্যোতিরিন্দ্রনাথের নাটকের প্রভাব অন্যান্য নাট্যকারদের কিভাবে চালিত করেছে তার অজস্র উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে। ইতিহাসাশ্রিত ঘটনা অবলম্বনে দেশপ্রেমপ্রচার সেযুগের নাট্যকারদের ফ্যাসানে দাঁড়িয়েছিল বললেও ভুল বলা হয় না। শুধু একটি বিদেশীশক্তির আক্রমণ ও একটি স্বদেশী চরিত্র থাকলেই এ ধরণের নাটক রচনা করা যেত অনায়াসে। নাটকের বক্তব্য ও ইতিহাসের সিদ্ধান্ত যতই বিরোধমূলক হোক না কেন, দেশপ্রেমের উচ্ছ্বাস প্রকাশের বিস্তীর্ণ ক্ষেত্র রচনায় বাধা ছিল না। এ প্রসঙ্গে বিপিনবিহারী পালের 'বঙ্গের পুনরুদ্ধার' [১৮৭৪] নাটকটির নাম করা যেতে পারে। গিয়াসুদ্দীনের সঙ্গে রাজা গণেশের সংঘর্ষ কাহিনীভিত্তিক এ নাটকে গতানুগতিকতা ছাড়া আর কীই বা আশা করা যায়? কিংবা নবীনচন্দ্র বিদ্যারত্নের "ভারতের সুখশশী যবন কবলে" [১৮৭৫] নাটকের উল্লেখ করা যায়। এই নাটকদ্বয়ের রচনাকাল 'পুরুবিক্রম নাটকের' রচনাকালের সমসাময়িক। লক্ষ্যণীয়

এই যে, স্বদেশপ্রেমের আবেগ সেযুগের নাট্যকারদের কিভাবে চালিত করেছিল তা এই রচনা-কৌশল থেকে সহজেই অনুমেয়। এ ধরণের অজস্র নাটক যেমন লেখা হোত, তেমনি তার সমালোচনাও কম হয়নি।

জ্যোতিরিন্দ্রনাথের সমসাময়িক নাট্যকার উপেন্দ্রনাথ দাস স্বদেশপ্রেমের নাটকে একটু নতুন রসসঞ্চার করলেন। নাটমঞ্চের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে সংযুক্ত নাট্যকার উপেন্দ্রনাথের নাট্যসাহিত্যে দান হয়ত তেমন কিছুই নয়,—কিন্তু সেযুগের রঙ্গমঞ্চের কর্ণধাররূপে উপেন্দ্রনাথের একটি বিশিষ্ট পরিচয় রয়েছে। ইতিহাসাশ্রিত নাটকের স্বদেশপ্রেম প্রসঙ্গ বর্জন করেই তিনি মৌলিকত্বের পরিচয় দিয়েছিলেন। জ্যোতিরিন্দ্র-নাথের নাটকে যে অভাব বোধ আমাদের মনে প্রশ্ন জাগিয়েছিল তাঁর সমসাময়িক নাট্যকারের নাটকেই সমাজভিত্তিক স্বদেশপ্রেমাত্মক কাহিনীর সাক্ষাৎ মিলছে—এটাই সান্ত্বনার কথা। উপেন্দ্রনাথের এই স্বকীয়তাই আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। তার প্রথম নাটকের রচনাকাল 'পুরুবিক্রমের' সমসাময়িক হলেও 'পুরুবিক্রমের' অভিনয় হয়েছিল আগেই। "শরৎ সরোজিনী"-তে উপেন্দ্রনাথ দাস আত্মগোপন না করে পারেননি। দুর্গাদাস দাস ছদ্মনামে আত্মগোপনের প্রয়াসটুকু নাট্যকারের দূরদর্শিতারই পরিচায়ক। নাট্যশালার সঙ্গে ঘনিষ্টভাবে সংযুক্ত থেকেই নাট্যকার সে যুগের আবহাওয়াটি হৃদয়ঙ্গম করেছিলেন। দেশপ্রেমের প্রকাশ্য বক্তব্য যে কোন মুহূর্তে যে বিপদ ডেকে আনতে পারে এ ধারণা তাঁর ছিল। সেযুগীয় সমাজে স্বাধীনতা আন্দোলনের প্রস্তুতি কিভাবে চলছিল তারই অস্পষ্ট আভাস ও কাল্পনিক বিবরণ নাটকটিতে স্থান পেয়েছে। দেশচেতনা শিক্ষিত বাঙ্গালীর শিরার ধমনীতে প্রবাহিত হোক—এই স্বপ্ন ও কল্পনা অতিরঞ্জিত হলেও সে যুগের সমাজে এর একটা মূল্য ছিল। তাছাড়া শুধু দেশোদ্ধারের স্বপ্ন দেখলেই যথেষ্ট হবে না, দেশোদ্ধারের সম্ভাব্য পন্থা আবিষ্কার করতে হবে, এই ছিল নাট্যকারের অভিপ্রেত। শিক্ষিত বাঙ্গালীর দেশ-সাধনা যে নাটকের বিষয়বস্তু হতে পারে উপেন্দ্রনাথের নাটকদুটি না পেলে এ সম্পর্কে একটা সংশয় থেকে যেতো। কারণ সামগ্রিক সমাজকে নাটকে স্থান দেওয়ার প্রথাটি সেযুগে প্রায় অপ্রচলিত রীতিতে পর্যবসিত হতে বসেছিল। 'কুলীন কুল-সর্বস্ব' থেকে 'নীলদর্পণ', 'সধবার একাদশী'তে সমাজচিত্রণের যে প্রবণতা ধরা পড়েছিল, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ প্রমুখের অতীতচারিতার আতিশয্যে তা প্রায় লুপ্ত হতে বসেছিল। কিন্তু অভিনয়ের ইতিহাস আলোচনা করলে দেখা যাবে যে, সামাজিক নাটকের প্রতি প্রবল অনুরাগ সে যুগেও ছিল। দীনবন্ধুর সামাজিক নাটকগুলির আবেদন কিংবা জ্যোতিরিন্দ্রনাথের প্রহসনের আবেদন যে কত বেশী ছিল তা বোঝা যায় এদের অভিনয়ের আধিক্য থেকে। তুলনায় ঐতিহাসিক ও রোম্যান্টিক

অর্ধকাল্পনিক নাটকের চাহিদা ছিল কম। উপেন্দ্রনাথ জ্যোতিরিন্দ্রনাথের সমসাময়িক কালের নাট্যকার হয়েও, জ্যোতিরিন্দ্রনাথের দেশপ্রেমাদর্শে অনুপ্রাণিত হয়েও বিষয়বস্তু অনুসন্ধান করেছেন সে যুগের সামাজিক পটভূমিকায়। এ প্রসঙ্গে শ্রীসুকুমার সেন বলেছেন,—

"খুন-জখমের বাড়াবাড়ি এবং পিস্তল বন্দুক লাঠির হুড়াহুড়ি সমসাময়িক সমাজ-চিত্র নাট্যে এই প্রথম দেখা গেল। দেশপ্রেমের উদ্দীপনা তো আছেই, সেই সঙ্গে দেশকে স্বাধীন করার উদ্দেশ্যে বৈপ্লবিক চেষ্টার ইঙ্গিতও রহিয়াছে।"[৩৯]

"শরৎ সরোজিনী" ও "সুরেন্দ্র বিনোদিনী"—এই দুটি নাটক খুব অল্প সময়ের ব্যবধানেই প্রকাশিত ও অভিনীত হয়েছিল। ১৮৭৫ সালের জানুয়ারী থেকে আগস্টের মধ্যে "শরৎ সরোজিনীর" ৬টি অভিনয়ের সংবাদ পাওয়া যাচ্ছে এবং সেই সঙ্গে 'পুরুবিক্রম নাটকের' মাত্র একবার অভিনয়ের উল্লেখ পাওয়া যায়। এর কারণ অবশ্যই আছে। খুব বেশীবার অভিনীত না হলেও 'পুরুবিক্রমের' সাহিত্য মূল্য স্বীকৃত হয়েছিল সে যুগে এবং 'পুরুবিক্রমের' প্রভাব উপেন্দ্রনাথ দাসের উপরেও পড়েছিল গভীর ভাবে।

নাট্যাভিনয়ের মানদণ্ডে নাটকবিচারের সাধারণরীতি প্রচলিত হলেও সার্থকতা কেবলমাত্র অভিনয়ের উপরই নির্ভরশীল নয়। উপেন্দ্রনাথের নাটকের অজস্র অভিনয় হলেও নাট্যকার হিসেবে তিনি সাহিত্যইতিহাসে স্থান পেয়েছেন কোনো মতে। আপাততঃ সে বিচারও নিরর্থক। আমরা শুধু দেশপ্রেম কথা উপেন্দ্রনাথের নাটকে যে ভাবে প্রতিফলিত হয়েছিল তার স্বরূপ নির্ধারণে প্রয়াসী। "শরৎ-সরোজিনীর" প্রথম অভিনয়ের বিবরণেই এই নাটকের জনপ্রিয়তা ঘোষিত হয়েছে। সমকালীন চেতনার প্রতিফলনের সুন্দর প্রতিক্রিয়া এটি। দেশচেতন দর্শকগোষ্ঠী এ নাটকের বিচার করেছে সম্পূর্ণ অন্যনিয়মে।

১৮৭৫ সালের ২রা জানুয়ারী প্রথম অভিনীত হয়েছিল নাটকটি। অমৃতবাজার পত্রিকায়, ১৪ই তারিখে দ্বিতীয় দিনের অভিনয়ের বিবরণে সে যুগের দর্শকের চাহিদার তীব্রতাটি বোঝা যায়।

"শরৎ-সরোজিনী' নাটকের অভিনয় দেখিবার নিমিত্ত নগরবাসীদের এইরূপ কৌতূহল ও ব্যগ্রতা জন্মিয়াছিল, যে শুনিতে পাওয়া যায় নাকি স্থানাভাব প্রযুক্ত চারি পাঁচশত লোককে ফিরিয়া যাইতে হইয়াছিল।"

সে যুগের দর্শকের এই আকাঙ্ক্ষা থেকেই জনগণের দেশচেতনার একটা সাধারণ

---

৩৯. সুকুমার সেন, বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস (২য় খণ্ড), বর্দ্ধমান সাহিত্য সভা, ১৩৬২, পৃঃ ২৬৯

রূপ আবিষ্কার করা যায়। অবশ্য "শরৎ সরোজিনীর" অন্যতম আকর্ষণ ছিল সেযুগীয় সমাজচিত্রের একটি বোধগম্য রূপ। তরুণ জমিদার শরৎকুমার উচ্চশিক্ষার সঙ্গে দেশসেবার দীক্ষালাভ করেছে। বাংলাদেশের অভিনয়োচ্ছ্বাস লক্ষ্য করে কোন চরিত্র যখন ব্যঙ্গ করে বলে,—

"আপনারা কোথায় অভিনয় দেখতে যাচ্ছেন? অভিনয় মন্দিরের ত আজকাল ছড়াছড়ি।"[৪০] [১ম অঙ্ক, ১ম গর্ভাঙ্ক]

তরুণ নায়কের আদর্শ সেখানে উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠে। সে যুগের একমাত্র সাধনাই যে দেশসাধনা—একমাত্র লক্ষ্য যে দেশোদ্ধার একথা শরতের মুখেই প্রথম শুনি। আত্মসমালোচনায় অকুণ্ঠ এই আদর্শবাদী নায়ক নিছক প্রেমসর্বস্ব নাটকের অভিনয়ে তীব্র আপত্তি জানিয়েছে,—

"প্রণয়ে মত্ত হবার কি এই সময়? আমাদের ঘৃণা নাই? গরু গাধার মত দিবারাত্র শাসিত হচ্ছি, তাকি মনে থাকে না? পদে পদে ইংরাজদের বিজাতীয় অহঙ্কার দেখেও কি ধমনীতে বিদ্যুতের মত ধাবিত হয় না? শরীর উত্তপ্ত হয় না? মনে ধিক্কার জন্মায় না? এখন অন্য ইচ্ছা? অন্য অভিলাষ?" এর উত্তরে যখন প্রশ্ন করা হয়,—"তবে বন্দুক ধরুন না কেন?" তখন শরৎ আমাদের প্রকৃত আত্মচিত্র উদ্‌ঘাটন করে,—"আমরা যে হতভাগা কাপুরুষের জাত, দুশ তিনশ বৎসরের মধ্যে যে হবে এমন আশাও মনে স্থান পায় না। কিন্তু যতদিন না ভারতে স্বাধীনতা সূর্য্য পুনরুদয় হয়, যতদিন না অত্যাচারের লোহিতমুণ্ড আমরা পদতলে লুণ্ঠিত দলিত করতে পারি, ততদিন যে প্রণয়, কি অন্য কোন পশুবৃত্তির অনুসরণ করবে সে কৃতঘ্ন-পামর -নরাধম-দেশের কুসন্তান।" [১ম অঙ্ক, ১ম গর্ভাঙ্ক]

এমন উজ্জ্বল ও সরল আদর্শকে নাট্যকার সেযুগের একটি শিক্ষিত যুবকের মুখে সংলাপরূপে আরোপ করেছিলেন। দেশারাধনার পবিত্র কর্তব্য স্মরণ করিয়ে দেওয়ার দায়িত্ব নিয়েই নাট্যকারের আবির্ভাব হয়েছে যেন। দেশপ্রেমের কাল্পনিক পটভূমিকাটির রোম্যান্টিক আবরণ সরিয়ে দিয়ে আমাদের দৈনন্দিন জীবনের ধূলিমলিন মাটিতে সময়োচিত ও আকাঙ্ক্ষিত এই বক্তব্যটি পরিবেশনে নাট্যকার কুণ্ঠাহীন নির্ভীকতার পরিচয় দিয়েছেন। নাটকটির জনপ্রিয়তার কারণ অনুসন্ধানের জন্য খুব দূরে যেতে হয় না,—এই অকপট আদর্শ ততোধিক পরিচিত একটি সেকালীন যুবকের জীবনাদর্শরূপে কল্পনা করে নাট্যকার স্বাভাবিক সত্যকেই তুলে ধরেছেন। এ প্রসঙ্গে শ্রীসুকুমার সেনের সমালোচনাটি যথার্থ,—

৪০. উপেন্দ্রনাথ দাস, শরৎ সরোজিনী নাটক, ১২৮৩।

"যে সময়ে নাটকখানি রচিত হইয়াছিল তখনকার দিনের স্বদেশপ্রিয় শিক্ষিত যুবকদের মনোভাবের পরিচয় ইহাতে স্পষ্টভাবে আছে। এইটুকুই শরৎ সরোজিনীর প্রকৃত মূল্য।"[৪১]

এই প্রকৃতমূল্যই এ নাটকের একমাত্র মূল্য। স্বাধীনতার আদর্শ বাদ দিলে নাটকটিতে কোন নাটকীয় বক্তব্য ছিল না। ঘটনা ও চরিত্রের শিথিল রূপ নাটকটিতে পীড়াদায়ক রূপে দেখা যায়। আদর্শবাদের প্রলেপটুকু সরিয়ে নিলে নাটকটির বক্তব্য অত্যন্ত সাধারণশ্রেণীর মধ্যে গণ্য হোত। শরতের আদর্শবাদ দর্শককে মুগ্ধ করে রাখার পক্ষে যথেষ্ট ছিল। নাট্যকারের সমস্ত লক্ষ্য ছিল এই চরিত্রটিকে ঘিরে।

আদর্শবাদী শরৎ চরিত্রটিতে কোন দ্বন্দ্ব সৃষ্টির চেষ্টামাত্র করেননি নাট্যকার—নির্দ্বন্দ্ব ও দেশপ্রেমস্বপ্নে মগ্ন শরতের একমাত্র চিন্তা দেশকে ঘিরে। দেশের পরাধীনতাশৃঙ্খল মোচন ভিন্ন অন্যচিন্তা তাঁর বিচারে অপরাধ, তাই নিতান্ত ব্যক্তিগত প্রেমভালবাসার চিন্তাকেও বর্জন করার প্রয়াস করেছে সে। অথচ মাঝে মাঝে সে যে দুর্বলবোধ করে না এমন নয়, ইডেন উদ্যানে ভ্রমণরত শরতের আত্মচিন্তায় নাটকীয়তা নেই কিন্তু আদর্শবাদ আছে পুরোমাত্রায়। দেশের দুরবস্থার চিত্রটি মনে মনে খতিয়ে দেখে সে,—

"ভারতের অবনয় এত গভীর ও সর্বগ্রাসী, যে এই ঘৃণিত পরাধীনতার স্থায়িত্বই এখন আমাদের ভাবী উন্নতির একমাত্র পথ হয়ে দাঁড়িয়েছে। সমাজের অন্তঃস্থল পর্যন্ত ভীষণ ব্যাধিসমাচ্ছন্ন, এ অবস্থায় ইংরাজরাজের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করতে যে পরামর্শ দেয়, বা ইচ্ছা প্রকাশ করে, সে শুদ্ধ মূঢ় ও অবিবেচক নয়—দেশের শত্রু।" [১ম অঙ্ক, ২য় গর্ভাঙ্ক]

শরৎ আদর্শবাসী কিন্তু তার যাত্রাপথে সে একক। এই নিঃসঙ্গতা আদর্শবাদকে দুর্বল করে দেয়। বহুর সঙ্গে মিলিত হলে সে আদর্শ সার্থকতা লাভ করে। খল চরিত্ররূপে যার আবির্ভাব সেই মতিলালও শরৎকে ব্যঙ্গ করেছে এই বলে,

'দু এক বেটা লেখাপড়া শিখে আবার দেশহিতৈষী হতে আরম্ভ করেছেন! আরে আমার দেশহিতৈষী রে! মরে গেলে বুঝি "দেশহিতৈষিতা" সঙ্গে যাবে?'

[১ম অঙ্ক, ৩য় গর্ভাঙ্ক]

তবু অমিত উদ্যমে দেশপ্রেমগর্ব নিয়েই শরৎ তাঁর ব্যক্তিত্ব ও আদর্শ বজায় রাখে। এদেশের বিদেশী শাসকের উদ্ধত শাসনের মূলোৎপাটনের স্বপ্ন দেখে সে।

---

৪১. সুকুমার সেন, বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস (২য় খণ্ড) বর্দ্ধমান সাহিত্য সভা, ১৩৬২ পৃঃ ২৭২।

উপেন্দ্রনাথের আদর্শ এই চরিত্রটি ঘিরে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠেছিল। শ্বেতকায়কে প্রভু বলে মেনে নেওয়ার মধ্যে যে চরিত্রগত দুর্বলতা ও কাপুরুষতার লক্ষণ রয়েছে, নাটকে বার বার সে বিষয়ে উল্লেখ করা হয়েছে। অন্যায়কারী ইংরাজকে বিন্দুমাত্র ভয় না পেয়ে দৈহিক শক্তি প্রয়োগের দুঃসাহসিক মনোভাব শরতচরিত্রে লক্ষ্য করা যায়। কাপুরুষ ও শক্তিহীন বাঙ্গালীদের মুখ রক্ষা করার দায়িত্ব যেন সে নিজেই মাথায় তুলে নিয়েছে। এ কাপুরুষতা ও ভীরুতার অপবাদ থেকে মুক্ত না হলে শুধু মানসিক শক্তির বড়াই করা অর্থহীন হবে। তাই এ নাটকের নায়ক অমিতশক্তি নিয়ে ইংরাজ সার্জনকে পদাঘাত করেছে। বীরত্বপূর্ণ সংলাপ তার অকুতোভয় চিত্তের পরিচয় দিয়েছে,—

"সাদা চামড়া দেখে লোকে আর ভয় করে না, জানিসনে নরাধম পশু ?"

[৩য় অঙ্ক, ১ম গর্ভাঙ্ক]

বাংলা নাটকে এই বক্তব্যটিও সম্ভবত অভিনব। ইংরেজ বিতাড়নের সম্মিলিত প্রচেষ্টার ঠিক আগেই ইংরেজবিদ্বেষ প্রতিটি মানুষের মনে উদগ্র হয়ে উঠাই স্বাভাবিক, নাট্যকার সেই কল্পনাটি নাটকে দৃশ্যাকারে স্থাপন করেছেন। ইতিপূর্বে যা ছিল আভাষিত-ব্যঞ্জিত 'শরৎ-সরোজিনীতে' নাট্যকার তা অনাবৃত ভাবে প্রকাশ করেছেন। একই সময়ে হেমচন্দ্র 'ভারত সঙ্গীত' রচনা করে রাজরোষে পড়েছিলেন,—তবু এ ধরণের প্রকাশ্য মনোভাব নাট্যকার গোপন করার বিন্দুমাত্র চেষ্টা করেননি, এটাই আশ্চর্য। "ভারত সঙ্গীতের" বক্তব্য আরও অনেক সংযত ও নিরুত্তাপ ছিল। এ নাটকে শরতের ইংরেজ বিদ্বেষ তীব্রতম। পরবর্তীযুগের স্বাধীনতা আন্দোলনের প্রস্তুতিপর্বের খসড়া এ নাটকটিতে যেন সূত্রাকারে ন্যস্ত করা হয়েছে। সেদিক থেকে এ নাটকের প্রচার-মূল্য অপরিসীম। নাটকের ইংরেজবিদ্বেষ সে যুগের উত্তপ্ত আবহাওয়ায় উত্তেজনা সঞ্চারের পক্ষে যথেষ্ট বলতে হয়।

ঘটনাগত জটিলতা সৃষ্টির প্রচেষ্টা নানাভাবে দেখা যায় এ নাটকে। স্বভাবদুর্বৃত্ত চরিত্রহীন জমিদারের জঘন্য ষড়যন্ত্র ও নীচতার চিত্র এ নাটকে সাড়ম্বরে দেখানো হয়েছে। কাহিনীগত জটিলতা বৃদ্ধির জন্যই খুন, হত্যা ও জখমের পরিকল্পনা করা হয়েছিল। এতে একধরণের উত্তেজনা সঞ্চারিত হয় নিশ্চয়ই,—অন্যদিকে নায়কের বীরত্ব প্রকাশেরও সুযোগ আসে। নায়কের গৃহ অকস্মাৎ মতিলালের দ্বারা আক্রান্ত হলে শরৎ ও সরোজিনী উভয়ে যথেষ্ট বীরত্বের পরিচয় দিয়েছে। মঞ্চে বন্দুক-পিস্তলের গোলাগুলি নিক্ষেপের দ্বারা সুলভ চমৎকারিত্ব সৃজনের সুযোগ মঞ্চাভিজ্ঞ নাট্যকার যে গ্রহণ করবেন এটাই স্বাভাবিক। শরতের বীরত্ব প্রকাশ পেয়েছে অতর্কিত আক্রমণ মুহূর্তে, সে বলেছে,—"আমি মরি, কিন্তু স্বর্গ সাক্ষী বাঙ্গালী

কাপুরুষ নয়।"—সরোজিনীও পিস্তল চালনা করে সাহসিকা বঙ্গনারীরূপে নিজের অসীম কৃতিত্ব প্রদর্শন করেছে।

মিলনান্তক এই নাটকের সর্বাপেক্ষা কষ্টকল্পিত ও অবাস্তব অংশ শরতের রাজমহল পাহাড় অঞ্চলে গমন ও সেখানকার মুসলমান ডাকাতদলের সঙ্গে পরিচয় লাভ। এদের অবাস্তব-দেশোদ্ধার স্বপ্ন ও মুসলমান রাজত্ব স্থাপনের চেষ্টা হাস্যকর পরিস্থিতির উদ্ভব করেছে। কিন্তু নাট্যকার শরতের মুখে ভবিষ্যৎ বাণী আরোপ করেছেন,—

"আমাদের দেশের কাপুরুষেরা এখনও স্বাধীনতার জন্য ব্যগ্র হয়নি। আর স্বাধীনতার নামে আপনাদের অধীনতা স্বীকার করতে কেউ সম্মত হবে না।

[পঞ্চম অঙ্ক, চতুর্থ গর্ভাঙ্ক]

নানা অদ্ভুত পরিস্থিতির মধ্যে এ নাটকের শেষাংশে জটিলতা বৃদ্ধি পেয়েছে। সরোজিনীর অন্তর্ধানেই এই জটিল অংশের উদ্ভব হয়েছে। শরত শেষ পর্যন্ত আদালতে অভিযুক্ত হয়েছে, গোরাসৈন্য মারার অপরাধে। শরতের বীরত্ব ও অসমসাহসিকতা এখানে আরও উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। ষষ্ঠ অঙ্ক, ষষ্ঠ গর্ভাঙ্কযুক্ত ঐ নাটকের নায়ক দেশোদ্ধারের আদর্শ নিয়েই আবির্ভূত হয়েছিলেন কিন্তু নাটকের সমাপ্তি অংশে এসে মহাখেদে আবিষ্কার করি যে, দেশোদ্ধার নয় শুধু অন্যায়ের বিরুদ্ধে ন্যায়ের অধিকার প্রতিষ্ঠা করেই তার বীরত্ব অবসিত হয়েছে। তাছাড়া ব্যক্তিগত জীবনের জটিলতার জাল ছিন্ন করতেই বহু মূল্যবান সময় নষ্ট করেছে সে। আদালতেও শরত আপন আদর্শ বজায় রাখার জন্য পণ করেছে,—

"উৎপীড়িত স্বদেশীয়দিগকে ধবলমূর্তিদের অত্যাচার হতে রক্ষা করবার জন্য যদি আমার জীবন বিসর্জন দিতে হয়, তাও দেব।" যে নাটকে নাটকীয়তা সৃষ্টির উদ্দেশ্যটাই গৌণ, আদর্শপ্রচারই মুখ্যস্থান অধিকার করেছে—সেখানে নাটকের দোষত্রুটির বিচারটাই মুখ্য বিচার নয়। আদর্শ প্রচারে ব্যগ্র ও নাটক রচনায় অন্যমনস্ক নাট্যকারের নাটক বিচারের মানদণ্ড নিশ্চয়ই ভিন্ন রকম হবে।

এ নাটকের মিলনান্তক অংশটি এমন অসঙ্গতিপূর্ণ যে নাট্যকারের বিমূঢ় মনোভাবের পরিচয় এখানে অত্যন্ত স্পষ্ট। নাটকে নায়ক নায়িকার মিলনান্তক পরিণতি দর্শকেরা চান,—নাট্যকারও অবহেলা করতে পারেন না সে দাবী, সুতরাং এ নাটকের শেষাংশে মিলন দৃশ্য রচিত হয়েছে যথানিয়মে। কিন্তু বিবাহ আসরে পরীরা যে সঙ্গীতটি নিবেদন করেছে তাতে মিলন মাধুর্য উপভোগের বাসনাটি প্রায় লুপ্ত হবার অবস্থা;—কারণ বক্তব্যটি নাটকেরই নয় নাট্যকারের। মিলন মুহূর্তে পরীর যে সঙ্গীতটির অবতারণা করেছে তাতে নিছক উপদেশ ছাড়া অন্য কিছুই নেই।

তোমাদের নিজ দোষে, আছ সবে পরবশ,
হীনবল, অপযশে ত্রিজগতে পূরিল।
নর নারী পরস্পরে, ভারত-উদ্ধার-তরে,
উদ্যোগী হও যত্নভরে, হও না তায় শিথিল॥

এ উপদেশটি নাট্যকারের সর্বশেষ আবেদন। মিলনমুহূর্তেও ভারতের স্বাধীনতা লাভের শপথটি বিস্মৃত হওয়া চলবে না,—কারণ তারপরেই উদ্ধৃতিটির নীচে নাট্যকার বলেছেন,—

'বজ্রধ্বনিতে ভারতের দৈর্ঘ্যেবিস্তারে কথাটি প্রতিধ্বনিত হউক।'—শরৎ সরোজিনীর মিলনবাসরে সমগ্র দর্শক সমাজের সম্মুখে নাট্যকারের এই বিচিত্র আবেদনে অসঙ্গতি থাকতে পারে কিন্তু অসংলগ্নতা নেই। নায়কের জীবন সাধনার ধারাটি এমনভাবে সমগ্র নাটকে পরিবেশন করা হয়েছে যে দেশপ্রেমের হাওয়াতে দর্শকসমাজ পূর্বেই আন্দোলিত হয়েছেন। খুন-জখম-নিরুদ্দেশ-গুপ্ত সভার জটিলতা ভেদ করেও যে সংবাদটি মুখ্যস্থান অধিকার করেছে, তা হচ্ছে নির্ভেজাল দেশপ্রীতি। সুতরাং বিপদমুক্ত নায়কের মিলনমুহূর্তেও আত্মবিস্মৃত হওয়া চলে না। দেশোদ্ধারের স্বপ্ন সফল করার জন্যেই মিলিত প্রয়াস দরকার, বিবাহবাসরে নাট্যকার সে সংবাদটুকুই পরিবেশন করেছেন,—এতে অসংলগ্নতা নেই। নাটকের শেষ গর্ভাঙ্কের সমালোচনার একটু নমুনা সেযুগীয় সংবাদপত্র থেকে উদ্ধার করা যায়,—

"শেষ গর্ভাঙ্কের অভিনয় এত উত্তম হইয়াছিল, যে দর্শকমণ্ডলীর অধিকাংশই অশ্রুবিসর্জন করিয়াছিলেন।" [আনন্দবাজার পত্রিকা, ১৪ই জানুয়ারী ১৮৭৫]

এই উপলব্ধি নাটকের গুণে বা অভিনয়ের গুণেও হতে পারে, তবে সেযুগের দর্শকের ভালো লাগার একটা কারণ খুব সহজেই অনুমেয়—তাঁরা যা চান নাট্যকার সেই বস্তুটি তেমন করেই পরিবেশন করার চেষ্টা করেছেন ত্রুটিহীনভাবে।

নাট্যকারের মঞ্চঅভিজ্ঞতা ও দর্শকচরিত্র সম্পর্কে মোটামুটি অভিজ্ঞতাই তাঁর নাটকের সাফল্যের অন্যতম হেতু ছিল, একথা অস্বীকার করা যায় না। নাট্যকার উপেন্দ্রনাথ বঙ্গরঙ্গমঞ্চের একজন উৎসাহী পৃষ্ঠপোষক। শুধুমাত্র নাটকরচনা করেই নয়, মঞ্চসেবায় আত্মোৎসর্গের আরও নজীর পাওয়া যায় তাঁর দ্বিতীয় নাটকের অভিনয় প্রসঙ্গে। প্রথম নাটকের অভাবিত সাফল্যের জন্যই তাঁর দ্বিতীয় নাটকের জন্ম হল অতি শীঘ্রই। ১৮৭৫ সালেই তাঁর দ্বিতীয় নাটক 'সুরেন্দ্র-বিনোদিনী' প্রকাশিত ও মঞ্চস্থ হয়। এই নাটকের অভিনয়ের সূত্র ধরেই রাজশক্তি নাট্যশালার ক্ষমতা নিয়ন্ত্রণ করার জন্য উদ্যত হয়েছিল। ১৮৭৬ সালের ৪ঠা মার্চ তারিখে নাট্যশালা নিয়ন্ত্রণ অর্ডিন্যান্সের বলেই থিয়েটারের ডিরেক্টর উপেন্দ্রনাথ ধৃত হয়েছিলেন,—একমাস বিনাশ্রম

কারাদণ্ড ভোগের আদেশ পেলেও শেষ পর্যন্ত হাইকোর্টের বিচারে মুক্তি পেলেন। কিন্তু 'Dramatic Performances Control Bill'—বঙ্গীয় নাট্যশালার অবাধ স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করেছিল। The Calcutta Gazettee [Dec 27, 1876]-এ প্রকাশিত আইনের সারমর্ম—

"Act no. XIX of 1876—An Act for the better control of public Dramatic Performances. This Act may be called "The Dramatic Performances Act 1876"

Whenever the Local Government is of opinion that any play, pantomime, or other drama performed or about to be performed in a public place is—

(a) of a scandalous or defamatory nature, or (b) likely to excite feelings of disaffection to the Government established by law in British India or (c) likely to deprave and corrupt persons present at the performance, the Local Government, or outside the Presidency Towns and Rangoon, the Local Government or such magistrate as it may by order prohibit the performance."

এতে খুব স্পষ্টভাবেই ব্যক্ত হয়েছে যে, রাজশক্তিবিরোধী জনচেতনা সঞ্চারের চেষ্টামাত্রই অপরাধ। এসব ঘটনার বিশেষ মূল্য স্বীকারের প্রয়োজন আছে,—কারণ গণচেতনার উচ্ছ্বসিত আবেগ যখন তুঙ্গশীর্ষে আরোহণের চেষ্টা করে চলেছে,—ঠিক সেই মুহূর্তে এই আইন পরোক্ষভাবে শক্তি সঞ্চয়েই সাহায্য করেছিল। স্বদেশচেতনা সঞ্চারের অপরিসীম ক্ষমতা যে নাট্যশালারই হাতে—এ সত্যটি গভর্নমেণ্ট আইনের সাহায্যে প্রমাণ করেছিলেন। অভিনয়ের মত শক্তিশালী জনমত গঠনের শক্তিকে দমিত করার এ চেষ্টাটি বাংলা নাট্যালয়ের ইতিহাসে একটি স্মরণীয় ঘটনা।

"সুরেন্দ্র-বিনোদিনী" নাটকের ওপর উপেন্দ্রনাথের প্রথম নাটকের পূর্ণ প্রভাব বর্তমান। দুটি নাটকের উপাদান সে যুগের উচ্চবিত্ত শিক্ষিত সমাজ থেকে আহরণ করা হয়েছে। নানা দুর্ঘটনা সৃষ্টি করে নাটকের জটিলতা বৃদ্ধির নজির এ নাটকেও মিলবে, কিন্তু এসব নিতান্তই ঘটনা মাত্র, নাটকীয় ঘটনা নয়। নায়ক-নায়িকার যথার্থ কোনো সমস্যা নেই,—কিন্তু নায়কের উগ্র আত্মসচেতনতা ও তীব্র দেশবোধ ঘটনাকে গুরুত্বদান করেছে। দুটি নাটকেই শিক্ষিত স্বদেশপ্রাণ ইংরেজবিদ্বেষী নির্ভীক যুবককে নায়করূপে দেখা যাচ্ছে। নায়িকাও নিতান্ত অশিক্ষিতা নয়,—সেকালীন রীতিনীতিতে অভ্যস্ত ও দেশসচেতন। নাট্যকার নারী

ও পুরুষ নির্বিশেষে দেশপ্রেমিকতা অনুসন্ধান করে চলেছেন,—দুটি নাটকেই এ দৃষ্টান্ত মিলবে।

উপেন্দ্রনাথের মঞ্চজ্ঞান তাঁর নাটকে বিশেষ ভাবে ধরা পড়েছিল। সেযুগের শিক্ষিত বাঙ্গালীর মনোমত কাহিনী নির্বাচনের দুরদর্শিতা সমসাময়িক নাট্যকারদের মধ্যে একমাত্র তাঁরই ছিল। কাল্পনিক হলেও সামাজিক চরিত্রালোচনার উপযোগিতাটি তিনিই প্রথম উপলব্ধি করেছিলেন। সমাজ সম্পর্ক শূন্য অতীতচারণা শুধু একটি আদর্শকেই তুলে ধরতে পারে,—বাস্তবজীবনের সঙ্গে যোগস্থাপনের সাধ্য তার থাকে না। উপেন্দ্রনাথের দুটি নায়কের নায়কই দেশপ্রেমী, শিক্ষিত, আত্মমর্যাদাসম্পন্ন ইংরেজবিদ্বেষী এবং নির্ভীক-আদর্শবাদী যুবক। আবার এরা বর্তমানেরই মানুষ। দর্শকের চিন্তা ভাবনার সঙ্গে নাটকীয় পাত্রপাত্রীর যোগাযোগ এত গভীর ও প্রত্যক্ষ যে এ ধরণের নাটক অতিসহজেই প্রভাব বিস্তার করতে পারে। "সুরেন্দ্র-বিনোদিনীর" নায়ক সুরেন্দ্র 'পুরু বিক্রম' নাটকের নায়ক পুরুর সঙ্গে নিজের তুলনা দিয়েছে এ নাটকে। অমিত সাহস ও নির্ভীকতা নিয়ে বিপক্ষশক্তির সঙ্গে সংঘর্ষে লিপ্ত হয়েছে সে। এতে নিছক আদর্শবাদের প্রতিফলন ছাড়া অন্য কিছু নেই। অত্যাচারী ইংরেজদের প্রতি আন্তরিক বিদ্বেষ সুরেন্দ্রের একটি বিশিষ্ট অনুভূতি। ইতিপূর্বে হতিহাসাশ্রিত যে কোন নাটকে যবন বিদ্বেষরূপে যা ব্যাখ্যাত, উপেন্দ্রনাথের নাটকে সরাসরি ভাবে তা ইংরেজবিদ্বেষে রূপান্তরিত হয়েছিল। এখানে নাট্যকারের দেশচেতনা ও নির্ভীকতাই প্রকাশ পেয়েছে। দুটি নাটকেই শ্বেতকায় ও এদেশীয়দের সংঘর্ষচিত্র স্থান পেয়েছে। যে যুগে ইঙ্গিতে আভাষে ইংরেজবিদ্বেষ প্রচার করার উপায় ছিল না,—সে যুগেরই নাট্যকার উপেন্দ্রনাথ অত্যন্ত স্পষ্টভাবে এ জাতীয় ঘটনা নাট্যদৃশ্য রূপে রচনা করেছিলেন। এ ধরণের ঘটনার নাট্যরূপ কিছুমাত্র অতিরঞ্জিত নয়,—কিন্তু পরাধীন জাতির সত্যকথনের স্বাধীনতা কেড়ে নিয়েছিল রাজশক্তি। অথচ নাট্যকার জানতেন সেযুগীয় দর্শকের সমর্থন ও অভিনন্দন তিনি পাবেনই। বাংলা নাটক পরবর্তীযুগে স্বাধীনতা আন্দোলনের উল্লেখযোগ্য বাহন হতে পেরেছিলো,—উপেন্দ্রনাথ বোধ করি এ ব্যাপারে অগ্রজ নাট্যকার। তবে দীনবন্ধু মিত্রের 'নীলদর্পণে'ই প্রথম রাজশক্তির বিরুদ্ধ সমালোচনার চিত্র পাওয়া যায়। তখনও নাট্যকারের ধারণায় ইংরেজবিদ্বেষবস্তুটি অকল্পিত ছিল—শুধু অত্যাচারী ইংরেজই তাঁর আক্রমণের লক্ষ্য ছিল, সৎ ও সজ্জন ইংরেজপ্রশস্তির অভাব কোথাও নেই। কিন্তু উপেন্দ্রনাথের নাটকে এই বক্তব্য একেবারেই পৃথকরূপে চিত্রিত হয়েছে। 'নীলদর্পণের' সঙ্গে 'শরৎ-সরোজিনীর' রচনাকালগত পার্থক্য মাত্র ১৪ বছরের। কিন্তু দীনবন্ধু ইংরেজ বিতাড়নের কথা চিন্তাও করেননি—অথচ মাত্র ১৪ বছরের মধ্যেই চিন্তাগত

ও আদর্শগত পরিবর্তন এত দ্রুতলয়ে ঘটেছে যে ইংরাজ বিতাড়ন ও স্বাধীন হওয়ার স্বপ্নটি এখন আর মোটেই কল্পনা মাত্র নয়, তা ধীরে ধীরে একটা সুচিন্তিত অবয়ব লাভ করবার আশায় দিন গুনছে। আর এ ব্যাপারে ইংরেজকে রাজশক্তি ও অত্যাচারী বলেই কল্পনা করা হয়েছে সামগ্রিকভাবে, কিছু উদার ও সজ্জন ইংরেজের প্রসঙ্গটি প্রায় বাদ পড়ে গেছে। স্বাধীনতা আন্দোলন যখন দানা বেঁধে ওঠেনি অথচ সে যুগের মানুষরা যেদিন একত্রিত হতে চাইছিল, সে মুহূর্তে উপেন্দ্রনাথের নাটক যে অত্যন্ত প্রতিক্রিয়াশীল রচনা বলেই অভিনন্দিত হবে তারও প্রমাণ রয়েছে। সে যুগের দর্শক শরৎ ও সুরেন্দ্রকে পরম আত্মীয় রূপে বরণ করে নিয়েছে। সরোজিনী-বিনোদিনীরা শরৎ ও সুরেন্দ্রের আদর্শকে শ্রেষ্ঠ মানবতার আদর্শ বলে শ্রদ্ধা জানিয়েছে,—এটি শুধুমাত্র নাট্যকারের রচনাদক্ষতার ফলাফল নয়। সেযুগের দর্শকেরা সারটুকু গ্রহণ করতে দ্বিধাবোধ করেনি। অবান্তর অংশের প্রতি অমনোযোগিতার বা অন্যমনস্কতার পরিচয় দিয়েই তাঁরা এ দুটি নাটকের মূলবক্তব্যের দ্বারা প্রভাবিত হতে চেয়েছিল, বিচারের এ চেষ্টাটিও সেযুগীয় জীবনচেতনারই লক্ষণ।

'সুরেন্দ্র-বিনোদিনীতে' প্রথমারম্ভটি আপাতঃদৃষ্টিতে অসংলগ্ন অর্থহীন ও মূল কাহিনীবিচ্ছিন্ন ঘটনা রূপেই প্রতিভাত হবে। অন্তঃপুরিকা নারী ভারতদুঃখে নিমগ্না হয়ে যে সংগীতটির অবতারণা করেছে তাতে নাটকের বীজসন্ধি বপন করা হয়নি, ঘটনাগত পরিচয় দানের চেষ্টাও নেই, কিন্তু নাট্যকারের আদর্শবাদের প্রসঙ্গটি আছে। ভারত দুঃখে মগ্না নারীর স্বদেশপ্রীতির প্রসঙ্গ ছাড়া অন্য কোন গভীর অর্থ অনুসন্ধান করাও অবান্তর। সার্থক বা অসার্থকভাবেই নাট্যকার তা পরিবেশনের উদ্দেশ্যেই নাটকটি পরিকল্পনা করেছেন। প্রথম অঙ্কের প্রথম গর্ভাঙ্কে অন্তঃপুরিকা একটি নারীর মুখে আমরা শুনি,

হায় কি তামসী নিশি ভারত মুখ ঢাকিল।
সোনার ভারত আহা ঘোর বিষাদে ডুবিল॥
শোক সাগরেতে ভাসি,
ভারত মা দিবানিশি
স্মরি পূর্ব যশোরাশি
কান্দিতেছে অবিরল,
কে এখন নিবারিবে,
জননীর অশ্রুজল।[৪২]

৪২. উপেন্দ্রনাথ দাস (দুর্গাদাস দাস ছদ্মনামে প্রকাশিত), সুরেন্দ্রবিনোদিনী, ১২৮৭

এ বক্তব্য সে যুগের দর্শকসমাজের কাছে নাট্যকারের গভীর জীবনবোধের অনুভবের কথা। নাট্যকারের সচেতন ভাবনাটির প্রসঙ্গই নাটকের প্রারম্ভে নিবেদন করা হয়েছে। আপাতঃভাবে অসংলগ্ন হলেও এই আলোকেই নাট্যকার ও নাটকটির বিচার হোক, এ বুঝি তাঁরই নির্দেশদান।

এ নাটকের নায়ক সুরেন্দ্র বিত্তবান, শিক্ষিত ও সচ্চরিত্র। দুরাচার ও লম্পট ম্যাজিষ্ট্রেটকে টাকা ধার দেওয়ায় তাঁর উদারতার কথাই মনে আসে—কিন্তু সেই দুরাচার যখন উদারতার সুযোগ নিয়ে অপমান করতে উদ্যত হয়, সুরেন্দ্র তাকে ক্ষমা করে না। সাহেব ও ম্যাজিষ্ট্রেট হলেও তার নীচ চরিত্রটি নাট্যকার খুব চমৎকাররূপে চিত্রিত করেছিলেন। দীনবন্ধু মিত্রের রোগসাহেবের জন্মান্তর হয়েছে ম্যাক্রেণ্ডেল রূপে। 'নীলদর্পণেও' দীনবন্ধু মিত্রের অভিযোগ ছিল ইংরাজ প্রবর্তিত বিচার পদ্ধতি সম্পর্কে। বিচারের এহসন ও বিচারের নামে অবিচারের পক্ষ সমর্থন দেখে দীনবন্ধু মিত্রও ক্ষুব্ধ হয়েছিলেন,—এ নাটকেও সেই বিচার প্রহসনের চূড়ান্ত নিদর্শন রয়েছে। বিচারক ম্যাজিষ্ট্রেটের সীমাহীন অত্যাচারের প্রামাণ্য দলিল নিখুঁতভাবে এ নাটকে পরিবেশন করা হয়েছে। সুরেন্দ্র প্রাপ্য টাকা ফেরত পায়নি, পরিবর্তে সাহেবের দম্ভ ও অন্যায় আস্ফালন শুনেছে,—

"নির্বোধ, আমি বাইবেল চুম্বন করিয়া শপথ পূর্বক যাহা বলিব, তাহার বিরুদ্ধে তোমাদের দুইশত বাঙ্গালীর সাক্ষ্য গ্রাহ্য হইবে না। এতকাল ইংরাজের রাজ্যে বাস করিয়া এই সামান্য জ্ঞান উপলব্ধি কর নাই? তোমার অজ্ঞতা দেখিয়া আমি আন্তরিক দুঃখিত হইলাম।" [১ম অঙ্ক, চতুর্থ গর্ভাঙ্ক]

সমগ্র বাঙ্গালী জাতির নির্বুদ্ধিতার এমন উৎকৃষ্ট উদাহরণ আর অন্য কোথাও দেখি না,—ম্যাক্রেণ্ডেল সুরেন্দ্রকে সাধারণ বাঙ্গালী বলে ভুল করেছিল। প্রতিকারে অক্ষম, দুঃখ ও অন্যায় সহনে অভ্যস্ত বাঙ্গালীর জাতীয় কলঙ্ক দূর করার জন্যই যে সুরেন্দ্র চরিত্রটির পরিকল্পনা। পদাঘাত করে সুরেন্দ্র ম্যাক্রেণ্ডেলের প্রত্যুত্তর দিয়েছে।

নাটকটিতে ঘটনাবর্ত সৃজনে কোন নতুনত্ব বা অভিনবত্ব নেই। "সুরেন্দ্র-বিনোদিনীর" বিবাহ সম্পাদনের পূর্বে কিছু বাহ্যিক জটিলতা সৃষ্টির উদ্যম করেছিলেন নাট্যকার, পরিশেষে 'সুরেন্দ্র-বিনোদিনীর' মিলনে কোন বাধাই অন্তরায় হয়নি। লাভ হয়েছে এই যে, হরিপ্রিয় বিরাজমোহিনীরও মিলনসেতুও রচিত হয়েছে। 'শরৎ-সরোজিনীর' মতই এ নাটকও মিলনান্তক সামাজিক রচনা। এ নাটকের বিরুদ্ধে আনীত অশ্লীলতার অভিযোগও শেষ পর্যন্ত অপ্রমাণিত থেকে গেছে। কিন্তু এই নাটকটির বিরুদ্ধে যে অভিযোগ আনা অত্যন্ত স্বাভাবিক ছিল তা কেন আনা হয়নি সেটাই আশ্চর্য। যাই হোক, অভিযোগের সেতু ধরেই নাট্যাভিনয় নিয়ন্ত্রণ আইন

বিধিবদ্ধ করেই সরকার অত্যন্ত স্বাভাবিক পথ অনুসরণ করেছিলেন। দেশাত্মবোধ সৃজনের এমন প্রকাশ্য চেষ্টাটি বন্ধ করার এ ছাড়া আর অন্য কোন উপায় ছিল না। এ সম্বন্ধে অমৃতবাজার পত্রিকার সমালোচনাটি আমাদের অসহায় আক্ষেপেরই অনুরণন। ১৮৭৬ সালের ১৪ই ডিসেম্বর অমৃতবাজার লিখেছিলেন,—"এ আইনের উদ্দেশ্য মহৎ হইতে পারে, ইহা দ্বারা গভর্নমেণ্ট আমাদের উপর আর একটি শাসন স্থাপন করিলেন। আমরা শাসনের প্রভাবে নির্জীব হইয়াছি। গভর্নমেণ্ট যদি আমাদের নিত্য নৈমিত্তিক সমুদয় কার্যের উপর পর পর এইরূপ শাসন স্থাপন করিতে থাকেন, তাহা হইলে বোধহয় আর দীর্ঘকাল আমাদের এ আইনের অধীন থাকিয়া ইংরাজ রাজার আজ্ঞা পালন করিতে হইবে না। ভারতবর্ষবাসীরা এরূপ স্থানে গমন করিবে যেখানে আর ইংরাজ শাসনের ভ্রূকুটিতে তাহাদিগকে ভীত করিতে পারিবে না।"

'শরৎ-সরোজিনী' 'সুরেন্দ্র-বিনোদিনী'-তেই নাট্যকার খুন-জখম, পিস্তল-বন্দুক, হত্যাকাণ্ড-মারামারির দৃশ্যগুলো নির্বিচারে নাটকে স্থান দিয়েছেন। প্রকাশ্য মঞ্চে এই উত্তেজনাকর দৃশ্য যে অত্যন্ত আকর্ষণীয় হয়ে উঠবে, তাতে সন্দেহ নেই। কিন্তু পরবর্তী নাট্যকারেরা এ নিয়ে সমালোচনা করেছেন তীব্রভাবে। উপেন্দ্রনাথের নাটকেই অভাবিত নাটকীয়ত্ব ও উদ্দেশ্যমূলক বক্তৃতার আধিক্য লক্ষ্য করা যায়। দুটি নাটকেই ইংরেজবিদ্বেষ ও শ্বেতকায় নিধনচেষ্টা এত স্পষ্ট ভাবে চিত্রিত হয়েছে যে নাট্যকারের দেশপ্রেমাদর্শ অত্যন্ত প্রকটভাবে ধরা পড়েছে। এই উদ্দেশ্যটি নাটকের ভূমিকাতেই নাট্যকার ব্যক্ত করেছিলেন। একটি পুস্তক প্রাপ্তির সংবাদ দিতে গিয়ে তিনি যে সরস সমালোচনার অবতারণা করেছিলেন, তার মূলে দেশচিন্তার ছাপ রয়েছে পুরোমাত্রায়। দেশহিতৈষিতা সে সময়ের একটি পরিচিত শব্দ এবং সমালোচকেরাও দেশহিতৈষণার স্বরূপ অনুসন্ধানের চেষ্টা করেছিলেন নানাভাবে। কাব্যে, নাটকে, প্রবন্ধে, সমালোচনায় সাংবাদিকতায় দেশহিতৈষণারই বিভিন্ন রূপ ধরা পড়েছে মাত্র। উপেন্দ্রনাথের সচেতনতা এ ব্যাপারে লক্ষ্যণীয়। দেশপ্রেমাদর্শই তাঁর নাটকের কাহিনী, চরিত্র ও ঘটনার মধ্যে প্রতিফলিত হয়েছিল, কিন্তু নিজেই তিনি সমালোচকের আদর্শ অনুসরণ করে দেশপ্রেমকেই ব্যঙ্গ করেছেন। পরোক্ষ ফললাভ হিসেবে বিরূপ সমালোচনাই যে অন্যতম প্রাপ্যবস্তু এ বিষয়ে তাঁর সতর্কতা ছিল।

উপেন্দ্রনাথের সমসাময়িক নাট্যকারদের মধ্যে প্রমথনাথ মিত্রের নাম উল্লেখযোগ্য। নানাভাবেই তিনি সেযুগীয় নাট্যকারদের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন। তাঁর প্রথম নাটকের কাহিনীর সঙ্গে ইতিহাস, বিশেষতঃ রাজস্থানের ইতিহাসের যোগসূত্র আছে। 'নগনলিনী' নামে প্রমথনাথ যে ইতিহাসভিত্তিক কল্পনাশ্রয়ী রোম্যান্টিক নাটকটি

সর্বপ্রথমে রচনা করেন তার ভূমিকায় উপেন্দ্রনাথ দাসের প্রতি কটাক্ষপাত লক্ষ্যণীয়,—

পাঠকগণ! নগ-নলিনী নাটক মধ্যে 'জয় ভারতের জয়' নাই, 'পাপিষ্ঠ ম্লেচ্ছ', 'দুরাচার যবন' নাই, 'হায়, স্বাধীনতা' নাই, 'ফোর্ট-উইলিয়ম' নাই, পিস্তল বন্দুক, লাঠি প্রভৃতি কিছুই নাই,—ইহারও যে আবার দ্বিতীয় সংস্করণ হইল, বড় আশ্চর্যের বিষয়!"[৪৩]

এই সমালোচনার অল্পকাল পরেই তিনি রীতিমত দেশাত্মবোধক একটি নাটক রচনা করে প্রমাণ করেছিলেন—সাময়িকতার মোহ থেকে মুক্তি পাওয়া সব লেখকের পক্ষেই কত অসম্ভব।

সেযুগের আরও একজন নাট্যকার উমেশচন্দ্র গুপ্ত উপেন্দ্রনাথকে ব্যঙ্গ করে একটি নাটকের ভূমিকায় বলেছিলেন,—

'জনৈক বন্ধু আমার বীরবালা গ্রন্থ উপহার প্রাপ্ত হইয়া আমাকে একখানি পত্র লিখিয়াছিলেন, তাহাতে এই একটি কথা ছিল, নির্বোধ! রুচির দিকে চাহিয়া এখন নাটক লিখিতে হয়, এখনকার রুচি, নায়ককে ডন কুইক্‌সটের মত সাজাইয়া এবং নায়িকাকে হারমনিয়ম বাজাইতে বাজাইতে গান করাইয়া পাঠকের এবং গ্রন্থ অভিনয়কালে দর্শকমণ্ডলীর সম্মুখবর্তী করা, দুই একটি জজ ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবকে নায়ক দ্বারা কোন উপায়ে জুতা, লাঠি, পিস্তল মারা কিম্বা প্রাণে বধ করা, একটি বাঙ্গালী বালিকা কর্তৃক বহুসংখ্যক গোরা সৈনিকের প্রতি বন্দুক বা পিস্তল ছোঁড়া, এ সকল তোমার বীরবালাতে নাই, গতিকেই ইহা মিষ্ট লাগিলেও দুর্গন্ধযুক্ত।'[৪৪]

এই ভূমিকায় লেখক রচিত "বীরবালা" নাটকের পরিচয় স্পষ্ট হয়নি, কিন্তু উপেন্দ্রনাথের নাটক দুটির বিষয়বস্তুর ধারাবাহিক বিবরণ দেওয়া হয়েছে। ইতিহাসের নামমাত্র সংযোগ রেখে নাট্যরচনার যে অসার্থক ও অনুল্লেখ্য চেষ্টা করেছিলেন এঁরা, তার চেয়ে উপেন্দ্রনাথের মৌলিক চিন্তাজাত নাটক দুটির মূল্য যে স্বাভাবিক বিচারেই অনেক বেশী হবে তাতে সন্দেহ কোথায়? উপেন্দ্রনাথ জ্যোতিরিন্দ্রনাথের যুগের নাট্যকার হয়েও চিন্তাভাবনায় মৌলিকত্বের পরিচয় দিয়েছিলেন সবদিক থেকেই। তাঁর অনুবর্তী নাট্যকারেরা তাঁকে প্রথমে আক্রমণ পরে অনুসরণ করে প্রমাণ করেছিলেন যে, মৌলিকত্ব সৃজনের সত্যিকারের ক্ষমতা তাঁদের নেই। উপেন্দ্রনাথ তাঁর সাময়িক নাট্যকারদের আক্রমণের হেতু হতে পেরেছিলেন বলেই আজকের বিচারে তাঁকে অনেক বেশী মূল্য না দিয়ে উপায় নেই।

৪৩. বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস (২য় খণ্ড) থেকে উদ্ধৃত। পৃঃ ২৭৬।

৪৪. বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস (২য় খণ্ড) থেকে উদ্ধৃত। পৃঃ ২৭৮।

নিছক ইতিহাস কিংবা বিন্দুমাত্র ইতিহাসের সূত্র অবলম্বন করে অসার্থক কল্পনাজাল বিস্তার করার সুলভ পথটি প্রথমাবধি বর্জন করেই উপেন্দ্রনাথ আমাদের সশ্রদ্ধ দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন।

লক্ষ্যণীয় যে, ঠিক এ ধরণের সামাজিক নাটক সেযুগে খুব বেশী লেখা হয়নি। অন্যান্য সামাজিক সমস্যা অবলম্বনে কিছু কিছু সামাজিক প্রহসন ও নাটক লেখার চেষ্টা হলেও 'শরৎ-সরোজিনী' বা 'সুরেন্দ্র-বিনোদিনীর' মত নিতান্ত দেশপ্রেমমূলক, সামাজিক নাটক আর রচিত হয়নি। কিন্তু "পুরুবিক্রম" কিংবা 'স্বপ্নময়ীর' অনুসৃতি চলেছিল নানা অক্ষম ও স্বল্পক্ষম নাট্যকারদের অনুশীলনের মাধ্যমে। 'শরৎ-সরোজিনীর' আদর্শবাদী নায়ক শরৎ ও 'সুরেন্দ্র-বিনোদিনীর' নির্ভীক ও সত্যসন্ধী নায়ক সুরেন্দ্রকে বহু আদর্শবান ঐতিহাসিক চরিত্রের ভীড়েও হারিয়ে ফেলা যায় না। দূর ইতিহাসের অচেনা চরিত্রকে কল্পনা করে নিতে কিছু সময়ের প্রয়োজন হয়, মধ্যবিত্ত ও উচ্চবিত্ত সম্প্রদায়ের আলোকপ্রাপ্ত উনবিংশ শতকীয় পুরুষ চরিত্রের নজির হিসেবে শরৎ ও সুরেন্দ্র অনেক বেশী পরিচিত। স্বাধীনতা আন্দোলনে যোগদানের প্রচেষ্টা কিভাবে শিক্ষিত বাঙ্গালী যুবকের জীবনচর্যায় স্থান পেয়েছিল তার নজির হিসেবে কাল্পনিক হলেও উপেন্দ্রনাথের সৃষ্ট নায়ক চরিত্র দুটির উল্লেখ করতে হয় সবার আগে।

"নগ-নলিনী" নাটকে উপেন্দ্রনাথের সমালোচনা করেও দ্বিতীয় নাটকে প্রমথনাথ মিত্র দেশপ্রেমের ভাবনাকেই মুখ্য স্থান দিয়েছিলেন। তাঁর দ্বিতীয় রচনা 'জয়পালে' জ্যোতিরিন্দ্রনাথের প্রভাব অত্যন্ত স্পষ্ট। বিষয়বস্তুর পরিকল্পনায় জ্যোতিরিন্দ্রনাথের অনুসরণ শুধু যে তিনিই করেছিলেন তা নয়,—সে যুগের ইতিহাসভিত্তিক ও স্বদেশাত্মক নাট্যরচয়িতাগোষ্ঠী এ ব্যাপারে জ্যোতিরিন্দ্রনাথের ধ্রুব পথটি নির্বিচারে অবলম্বন করে নিশ্চিন্ত হয়েছিলেন।

বহিঃশত্রুর আক্রমণে বিধ্বস্ত ভারতের ইতিহাস খুঁজলে একই বিষয়ের পুনরুল্লেখ মিলবে। বিদেশী শত্রুরা অমিত শক্তি নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়েছে এদেশে, জনপদ লুণ্ঠন করেছে, বন্দী করেছে দুর্বল রাজশক্তিকে, জয়পতাকা উড়িয়েছে ভারতের আকাশে। অসংখ্য যুক্তি দিয়েও ভারত ইতিহাসের এই কলঙ্কের কাহিনী মুছে ফেলা সম্ভব নয়। বিদেশীশক্তির সঙ্গে ক্ষমতার লড়াইয়ে হেরে না গেলে নিজেদের দুর্বলতার প্রসঙ্গটি চাপা দেওয়া যেতো। কিন্তু দীর্ঘদিন ধরে তুর্কী, মোঘল, পাঠান রাজারা এদেশ শাসন করেছেন অমিতবিক্রমে, কিন্তু দীর্ঘদিনের পরাধীনতার ইতিহাসে যে নজীর সুলভ নয় উনবিংশ শতাব্দীর আত্মজাগরণের লগ্নে তা সম্ভব হল। এঁরা দেখালেন বিদেশীশত্রু এদের জয় করেছে ঠিকই—কিন্তু সে জয়ের পেছনে আছে তুমুল সংগ্রামের পটভূমিকা।

দেশকে বিদেশীর কবল থেকে মুক্ত করার তীব্র আকাঙ্ক্ষা ছিল বলেই বহিরাগত শক্তির জয়লাভের পথটি কণ্টকাকীর্ণ হয়েছিল। প্রমথনাথ মিত্র 'জয়পাল' নাটকের কাহিনী বেছে নিয়েছেন একটি বিশেষ উদ্দেশ্য নিয়ে। অপ্রতিদ্বন্দ্বী তুর্কী সুলতান মামুদের এদেশ জয়ের ঘটনাটি তিনি নাটকে স্থান দিয়েছেন। কল্পনা করেছেন লাহোরাধিপতি জয়পালকে একজন বিশ্বস্ত স্বদেশপ্রেমিক রূপে, যিনি সুলতান মামুদের আক্রমণ প্রতিরোধ করার জন্য সর্বশক্তি নিয়োগ করেছিলেন। এই কল্পনায় প্রমথনাথের মৌলিকত্ব খুব বেশী নেই,—কারণ ইতিহাসাশ্রিত স্বদেশাত্মক নাটকরচনার বাঁধাধরা রীতিটি তিনি অনুসরণ করেছিলেন মাত্র। কিন্তু সুলতান মামুদকে প্রতিনায়ক হিসেবে কল্পনা করে ভারত ইতিহাসের একটি মসীলিপ্ত অধ্যায়কে খানিকটা কলঙ্কমুক্ত করার এই শুভ প্রয়াসটি তার মৌলিকত্ব সূচনা করে।

এ নাটকের মুখ্যচরিত্রগুলোর স্বদেশপ্রাণতা লক্ষ্যণীয়। সেনাপতি সংগ্রামসিংহ, রাজপুত্র অনঙ্গপাল, সহকারী সেনাপতি বিজয়কেতু—দেশের এই তরুণ যুবশক্তি একত্রে দেশরক্ষার শপথ গ্রহণ করেছে। নাট্যকারের সুপ্ত দেশচেতনাটি এখানে কাজ করেছে। জয়পাল দুর্ভাগ্য নিয়ে জন্মেছেন,—বিদেশী শত্রু এসে দ্বারে হানা দিয়েছে তাঁরই রাজত্বকালে, কিন্তু তিনি সার্থক রাজা; বিপদকে তিনি তুচ্ছ করেছেন, যোগ্যপুত্র ও যোগ্যসেনাপতি তাঁকে সাহায্য করেছে সর্বদা।

প্রাচীন রীতি ও আঙ্গিকের প্রথায় রচিত এ নাটকে আমরা দেবতা-নর-দস্যু -উদাসিনী-তপস্বিনী ও উদাসীন, সব রকম চরিত্রই খুঁজে পাবো। দেবতারাও চরিত্ররূপে কল্পিত,—ইন্দ্র ও সূর্য্য চরিত্র হিসেবে স্থান পেয়েছেন, গতানুগতিক প্রথায় ভবিষ্যৎবাণী করেছেন। নাটকের দিক থেকে এর কিছুমাত্র মূল্য নেই তবে এ নাটকের সঙ্গে কাব্যের কিছু মিল আবিষ্কার করা খুব দুরূহ ব্যাপার নয়। দেবতা চরিত্রকে ঐতিহাসিকতার মাঝখানে টেনে আনার পেছনে কাব্যের প্রভাবই খুব বেশী। মধুসূদনের "মেঘনাদ বধের" ভাষার গদ্যরূপ যেমন নাট্যকার সংলাপরূপে ব্যবহার করেছেন তেমনি দেবদেবীর মুখে কিছু শাশ্বতবাণী শোনাবার লোভটিও সংবরণ করতে পারেননি। এতে কিছু অসংগতি যে সৃষ্টি হয়েছে তাতে সন্দেহ নেই। দেশপ্রেমমূলক নাটকের স্থায়ীরস—বীর রস। জীবনযুদ্ধের ফলাফল জেনে ফেলার পরেও বীরত্ব দেখাবার মত মনোবল কোন কোন চরিত্রে থাকে। নাট্যকার অবশ্য ভাগ্যের দোহাই দিয়ে জয়পালের অসাফল্যকে সমবেদনা জ্ঞাপন করেছেন এ নাটকে। সার্থক সংলাপে বীররসের উন্মাদনা সৃষ্টির আন্তরিক প্রয়াস এ নাটকে লক্ষ্য করা যায়। গতানুগতিকতার মধ্যেও কিছু মৌলিকত্ব—আপাতঃবিরোধিতার মধ্যেও কিছু সান্ত্বনা এখানেই।

প্রথমেই দেশের দুর্দিনের আভাস দেওয়া হয়েছে। বিদেশী আক্রমণকারী ভারতজয়ে উদ্যত। রাজা জয়পাল সীমান্ত অঞ্চলের সম্রাট বলে শত্রুশক্তিকে বাধা দানের দায়িত্ব তাঁরই। রাজা চিন্তিত—কিন্তু সেনাপতিরা অকুতোভয়,—এঁদের বীরত্বপূর্ণ সংলাপ নাট্যকারের দেশাত্মবোধের পরিচায়ক। দেশের যুবশক্তির মুখে এই সাহসিকতার বাণী আরোপ করে নাট্যকার পরোক্ষভাবে কিছু ইঙ্গিত সৃজন করেছেন। সংগ্রামসিংহ, বিজয়কেতু, অনঙ্গপাল দেশাত্মবোধের ও নির্ভীকতার পরিচয় দিয়েছেন, "সংগ্রাম সিংহ—প্রাণ থাকতে পঞ্চনদ যবন অধিকারভুক্ত হবে না।

অনঙ্গপাল—যবনদের সহিত প্রাণপণে যুদ্ধ করব, স্বদেশরক্ষার জন্য জীবন দিতে কিছুমাত্র কুণ্ঠিত হব না।

বিজয়কেতু—চির স্বাধীন পঞ্চনদ কখনই অন্যের অধীনতা স্বীকার করবে না।"

[১ম অঙ্ক, ২য় দৃশ্য]

রাজপরিবারে প্রতিপালিত উদাসীন সদানন্দের দেশপ্রেমও সোচ্চার ও গভীর। সদানন্দ—ভারত যায়—রক্ষা করুন। ভারতের সৌভাগ্যশশী চিরকালের নিমিত্ত অস্তমিত হয়—রক্ষা করুন।। যবনেরা এসে দেশপ্লাবিত করে, সোনার ভারত ছারখার করে, রক্ষা করুন।। [১ম অঙ্ক, তৃতীয় দৃশ্য]

সদানন্দ নাটকের অনুল্লেখ্য পার্শ্বচরিত্র হলেও দেশপ্রেমের বক্তব্য নাট্যকার এই চরিত্রের মুখে আরোপ করেছেন। নাটকের জটিলতম মুহূর্তে সদানন্দ বিপদের গ্রন্থিগুলো অকুতোভয়ে ছিন্ন করেছে। রাজা জয়পালের সঙ্গে কথোপকথনেও গভীর দেশপ্রেমের বাণী উচ্চারিত হয়েছে,—

আমি বলছি পঞ্চনদ কখন সহজে আপনার স্বাধীনতা নষ্ট করবে না। আমি কিংবা বিজয়কেতু আপাততঃ কিছু বিমনা হয়েছি বলে তুমি ভয় পাচ্চ, কিন্তু সদানন্দ, এটি নিশ্চয় জেনো, ডমরুধ্বনি শ্রবণ করলে ফণী কখন স্থির ভাবে থাকতে পারে না। ...তুমি শুনবে, পঞ্চনদবাসীরা প্রত্যেকেই গম্ভীর স্বরে বলছে "জীবন থাকতে কখন বিদেশীয়ের বশ্যতা স্বীকার করব না, মন্ত্রের সাধন কিম্বা শরীর পতন।"[৪৫]

কিরণচন্দ্রের 'ভারতমাতায়' দেশপ্রেমোচ্ছ্বাসের বাণী বহন করেছে নারী। সম্ভবতঃ তার দ্বারা প্রভাবিত হয়েই উদাসিনী চরিত্রটি অঙ্কন করেছেন নাট্যকার—অবশ্য, 'পুরু বিক্রমের' ঐলবিলার দেশাত্মবোধের প্রভাব পড়াও খুব বিচিত্র নয়। নাট্যকার বিজয়কেতুর মুখে একটি সংলাপে জানিয়েছেন, "আমাদের স্ত্রীলোকেরাও স্বাধীনতার জন্য, স্বদেশরক্ষার জন্য, প্রাণ দিতে প্রস্তুত আছে।"—সে যুগীয় প্রভাব, মধুসূদনের

৪৫. প্রমথনাথ মিত্র, জয়পাল, ১৮৭৬।

নারীব্যক্তিত্ব আবিষ্কারের সূত্র ধরে সেকালের নাট্যকারগণও নারীর এই পৃথক চিন্তাধারাকে বিশেষ মর্যাদার সঙ্গে স্থান দিয়েছেন। তপস্বিনী ভারতের ভাবী অমঙ্গল চিন্তা করে মর্মাহত হয়েছে—এই দুর্দশায় ভারত জননীকে আহ্বান করে আক্ষেপ করেছে,—"জননি! ভারতের ভাবী দুর্দশাসকল বর্ণনা করে ভারতভূমির নিকট হতে চিরকালের জন্য বিদায় নিচ্ছেন। যবনেরাই ভারতের রাজসিংহাসনে উপবেশন করবে।—হায় বিধি। এই তোমার বিধি! মহারাজ! মহারাজ জয়পাল! আর কেন বৃথা চেষ্টা কর্‌চ, ভারতের স্বাধীনতা রক্ষা করতে পারবে না। উঃ! তোমার জীবন নাট্যের শেষ দৃশ্য কি ভয়ানক। [৩য় অঙ্ক, প্রথম দৃশ্য]

দেশচিন্তা তপস্বিনীকে মুহ্যমান করেছে। এই ভাবাবেগে দর্শকের চিত্তও আলোড়িত হয়। আবার ইন্দ্র ও সূর্য দুই দেবতার সংলাপেও খানিকটা মানবীয় ভাব আরোগ করেছেন। এই চরিত্র দুটির উপযোগিতা যে কিছুমাত্র ছিল না—সেকথা পূর্বেই বলেছি। "মেঘনাদ বধ কাব্যের" শক্তিহীন দেবতাদের মতই এঁরাও দৈবনির্ভর, বিধির বিধান মেনে নেওয়ার দুর্বলতা এদের চরিত্রে লক্ষ্যণীয়,—

ভারতে যবন প্রবেশ করেচে, যবনেরা ভারতের অধীশ্বর হবে, পাপমতি ম্লেচ্ছ-দিগের কর্কশ পদদণ্ডে দেবগণের ভক্তভূমি ভারতের কোমল হৃদয় দলিত হবে, এতে কার মন না সন্তাপানলে দগ্ধ হচ্চে? কিন্তু বিবেচনা করে দেখ যা হচ্চে, আর যা হবে সকলই বিধাতার ইচ্ছায়। [৩য় অঙ্ক, ৩য় দৃশ্য]

দেশপ্রেম ঊনবিংশ শতাব্দীর আবহাওয়াতে পুষ্ট ও ক্রমবর্ধমান একটি অনুভূতি যা অতি আলোচনার ফলে প্রায়ই বিশেষত্বহীন হয়ে পড়ছিল। গতানুগতিকভাবে দেশাত্মবোধ প্রচারের পথ অনুসরণ করতে গিয়েও প্রমথনাথ কিছু অভিনবত্ব সৃষ্টি করছেন। ভারত ইতিহাসের একটি লগ্নকে চিত্রিত করার সময় তিনি ঘটনাটিকে প্রায় পৌরাণিকতার পর্যায়ে এনে ফেলেছেন। চিন্তার দৈন্য—ঐতিহাসিকতার অবমাননা প্রকাশ পেলেও নিছক কল্পনাশ্রয়ী রচনা বলে যদি ধরে নিই তবে নাট্যকারের বিরুদ্ধে গুরুতর অভিযোগ আনা যায় না। দেশপ্রেম প্রচার করাই যাঁর লক্ষ্য,—উদ্দেশ্যের জন্য তিনি যদি মুখ্যকে গৌণ বলে মনে করে থাকেন তাঁকে খুব দোষ দেওয়া চলে না। দেশপ্রেম প্রসঙ্গটি শুধু মাত্র রাজা-রাজপুত্র-সেনাপতি-সৈনিক কিংবা আধপাগলা চরিত্রদের একচেটিয়া করে না রেখে তিনি সন্ন্যাসী-দেবতা এদেরও টেনে এনেছেন মাত্র। দেশের দুর্দিনের জন্য ক্ষোভ-দুঃখ ও আক্ষেপ প্রকাশ করে এঁরাও কর্তব্য পালন করেছেন।

"জয়পাল" নাটকের গভীরতম আর্তি আমরা জয়পালের মুখেই শুনতে পাই। রাজ্যরক্ষার আন্তরিক চেষ্টা সুমহতী হলেও বৃহৎশক্তির কাছে ক্ষুদ্রশক্তির পরাজয় ত

অনিবার্য—তাই জয়পালের প্রচেষ্টাও সফল হয়নি। দেশকে বিদেশীর হাতে সমর্পণ করার বেদনায় মহামান্য জয়পাল মর্মবিদারক উক্তি করেছিলেন,—

"জন্মভূমি! জন্মভূমি! পঞ্চনদ! ভারত! দুঃখিনী ভারত! আমার শত সহস্র জীবন দিলেও কি তোমার স্বাধীনতা একমুহূর্তের জন্য ফিরে পাওয়া যায় না,——আজ আর্যনাম আর্যগৌরব চিরকালের মত অস্তমিত হতে চলল, ভারতের আজ শেষ স্বাধীন নিশি!—জন্মভূমি! আমার অপরাধ মার্জনা কর আমি এই বিপদের সময় তোমায় পরিত্যাগ করে গেলুম।" [৫ম অঙ্ক, ২য় দৃশ্য]

এই বেদনাঘন বিলাপোক্তি যে করুণরস সঞ্চার করে তাও আমাদের দেশচেতনা জাগানোর পক্ষে সহায়তা করেছে। সে যুগের দেশাত্মবোধক নাটকের গতানুগতিকতা স্বীকার করেও বলা যায়, দেশপ্রেমাত্মক অংশটুকু যথেষ্ট হৃদ্য হয়েছে।

এই জাতীয় আরও একটি নাটকের রচয়িতা হচ্ছেন গঙ্গাধর ভট্টাচার্য—ইনি 'তারাবাই' রচনা করে দেশাত্মবোধের প্রসঙ্গ প্রচার করতে চেয়েছিলেন। দেশপ্রেম ছাড়া কোন লক্ষ্যণীয় বক্তব্য এ নাটকে নেই,—কোন উদ্দেশ্যও নাট্যকারের ছিল না। রাজস্থানের প্রচলিত কাহিনীর অনুসরণে নাটকটি লেখা। তবে বীরনারী তারাবাই-এর আদর্শে বঙ্গনারীও বীরাঙ্গনা হয়ে উঠুক এই কামনা করেছেন নাট্যকার। 'উপহারে' যে কবিতাটি যোজনা করেছেন সেটি লক্ষ্যণীয়,—

তারার মোহিনীমূর্তি ভাবিয়ে অন্তরে,
তারা হতে সাধ যেন সকলেতে করে।
তা হলে হিন্দুর পুনঃ গৌরব-তপন,
বঙ্গের আকাশে আসি দিবে দরশন।
সতীত্ব বীরত্ব দেশহিতৈষিতা আলো,
জ্বালিয়ে দেশের মুখ করিবে উজ্জ্বল।
হায়! কবে দেখিব রে ভরিয়ে নয়ন,
বীরপত্নী বীরমাতা বঙ্গযোসাগণ।
হয় যেন বঙ্গনারী সবে বীরাঙ্গনা,
গঙ্গাধর শর্মণের একান্ত বাসনা।"[৪৬]

অন্যান্য দেশাত্মবোধক নাটকের মত এখানে স্বদেশী সংগীত আরোপ করেছেন—কিন্তু আত্মশক্তির জাগরণ নয়, দেবতার আশ্রয় প্রার্থনা করেই নাট্যকার নিশ্চিন্ত। এ স্বদেশী সংগীতটি তাই একটু বিশিষ্ট।

৪৬. গঙ্গাধর ভট্টাচার্য, তারাবাই, ১২৮১।

দেশরক্ষা ধর্মরক্ষা কর গো কালিকে।
হিন্দুকুলে হিন্দুস্থান দেহি হিন্দু পালিকে॥

[১ম অঙ্ক, ২য় গর্ভাঙ্ক]

এ জাতীয় প্রার্থনায় যে স্বাধীনতা লাভ করা যায় না সে চেতনাটিও নাট্যকারের নেই। গতানুগতিকতার সঙ্গে প্রাচীনের ধর্মপ্রাণতা মিশেছে এখানে।

তারাবাই দেশোদ্ধারের জন্যই পুরুষোচিত শক্তি অর্জন করেছিলেন,—এ কাহিনীতে এই ব্যঞ্জনাটকু নাট্যকারেরই যোজনা। তারাবাই বলেছেন,—

"আমি নারীকুলে জন্মে পুরুষোচিত কার্য সমরবিদ্যা অধ্যয়ন কচ্চি কেন? কেবল পিতাকে সাহায্য কর্তে, স্বদেশের স্বজাতির স্বাধীনতারূপ অমূল্যধন দস্যুর গ্রাস থেকে পুনরুদ্ধার কর্তে, আর দুষ্ট অপহারকের বিনাশ কর্তে, আমি সমরানলে জীবন পর্যন্ত আহুতি দিতে প্রস্তুত আছি—" [ঐ]

এখানে তারাবাইকে জলন্ত স্বদেশপ্রেমিকা রূপেই কল্পনা করেছেন নাট্যকার। স্বাধীনতা আন্দোলনে বীরনারীরাও আমাদের সংগ্রাম শক্তি বৃদ্ধি করতে পারেন নাট্যকার সে আশা পূর্বেই ব্যক্ত করেছেন। দেশাত্মবোধের আবেগে তারাবাই অন্যত্রও বলেছেন,—

যারা স্বদেশের জন্মভূমির অধিকারিত্ব থেকে বঞ্চিত হয়েছে, যারা জীবনের সার স্বাধীনতারূপ অমূল্য ধন অপহারক দস্যুর গ্রাস থেকে রক্ষা কর্তে পারে নাই, তাদের আবার বিশ্রাম কি? সুখ ইচ্ছাই কি? স্বজাতির, স্ববংশের, স্বদেশের অপমানরূপ বৃশ্চিক দংশন সহ্য করলে কি নয়নে নিদ্রার আবির্ভাব হয়? যাদের হয় তারা মানবকুলে অত্যন্ত হেয়। [২য় অঙ্ক, ২য় গর্ভাঙ্ক]

এ জাতীয় উক্তি যে অত্যন্ত সময়োপযোগী ও মূল্যবান—সেটুকু সহজেই বোঝা যায়। দেশপ্রেমের প্রলেপেই এ নাটকের সব তুচ্ছতা ঢাকা পড়ে যায়। যদিও এ নাটক নাট্যকারকে প্রতিষ্ঠা, সাফল্য, সম্মান কিছুই এনে দেয় নি, কিন্তু তবুও দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ হয়েই নাট্যকারগোষ্ঠী এগিয়ে এসেছিলেন। দেশপ্রেমের বিশুদ্ধ আবেগে অনুপ্রাণিত এ জাতীয় সৃষ্টির মূল্য সেদিক থেকেই বিচার করতে হবে।

ষষ্ঠ অধ্যায়

উপন্যাস

উনবিংশ শতাব্দীর বাংলা সাহিত্যের সর্বাপেক্ষা বয়ঃকনিষ্ঠ সৃষ্টিকেই উপন্যাস আখ্যা দিতে পারি। বাদানুবাদের আড়াল থেকেও স্পষ্ট ভাবে এ সত্য অনুভব করা যায় যে প্যারীচাঁদ মিত্র কিংবা ভূদেব মুখোপাধ্যায় উপন্যাসের লক্ষণাক্রান্ত যে গ্রন্থ রচনা করেছিলেন তা পূর্ণ উপন্যাস নয়। সুতরাং ১৮৬৫ খ্রীষ্টাব্দে বঙ্কিমচন্দ্রের 'দুর্গেশনন্দিনীই' উপন্যাস রচনার প্রথম সোপান। সাহিত্যের অন্যান্য শাখায় স্বদেশপ্রেমের যে বাণী স্বতোৎসারিত ও উচ্ছ্বসিত বক্তব্যে পরিণত হয়েছে উপন্যাস নামক সর্বকনিষ্ঠ রচনা-সম্ভারেও তার প্রতিফলন পড়েছিল স্বতঃসিদ্ধভাবেই। যুগদর্পণ হিসেবেই সাহিত্যের বিচার হয়ে থাকে এবং উপন্যাস-নাটক-কাব্য-প্রবন্ধের গভীরে প্রবেশ করলে যুগচিত্রের নিখুঁত রূপই তাতে ধরা পড়তে দেখি। স্বদেশপ্রেমকে অবলম্বন করেই যে যুগজীবন উচ্চকিত হয়ে উঠেছিল—কাব্য-নাটকে যে চিত্র বারবার আমাদের সুপ্ত দেশচেতনাকে জাগিয়েছে, উপন্যাসেও তার নিবিড় পরিচয় রয়েছে। বঙ্কিমপূর্ব যুগেও উপন্যাস রচনার আকুতি এ দেশের মাটিতে ছিল এবং তা থাকাটাই স্বাভাবিক ও সঙ্গত। কোনো সৃষ্টিই আকস্মিক নয়, ঐতিহ্যের অনুভাবনা আমাদের চিত্তলোকের দ্বারে বার বার আঘাত করে বলেই প্রকাশের আকুলতা জাগে। কাজেই প্রথম উপন্যাসকার বঙ্কিমচন্দ্রের পূর্বসূরীরা উপন্যাসের যে খসড়া রচনা করে গেছেন—ধারাবাহিকভাবে সেখানেও স্বদেশচেতনার কোনো প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ পরিচয় আছে কি না দেখা দরকার। পূর্বেই বলেছি, এ যুগ দেশভাবনায় কল্লোলিত একটি উন্মুখর জনতার যুগ। যে পবিত্র ধ্যান সাধারণকে জাগিয়েছে—স্রষ্টার মনে তা এনেছে সৃজনের প্রেরণা। বস্তুতঃ ধ্যান ও ধারণার পূর্ণ রূপ যতক্ষণ না বাণীরূপ লাভ করছে ততক্ষণই সৃষ্টির ক্ষমতা নিয়ে সন্দেহ জাগে, যে সাহিত্যে তা উদ্ভাসিত—সমালোচক ও স্রষ্টা তাকে অভিনন্দন জানাতে দ্বিধাবোধ করেন না। উনবিংশ শতাব্দীর কাব্যে নাটকে দেশপ্রেমের যে উজ্জ্বল ভূমিকা সম্পর্কে আলোচনা করেছি—উপন্যাসে অবিকলভাবে সেই ভাব ও আদর্শ রক্ষা করা সম্ভব নয়। উপন্যাসের বিষয়বস্তু কাব্যের মত আত্মগত নয়—কিংবা নাটকের মত দৃশ্যগন্ধী নয়। উপন্যাসের গল্পরস ও কাহিনীধর্মিতা দেশপ্রেম প্রচারের সম্পূর্ণ প্রতিকূলই বলতে হয়। তবু কালের মন্দিরায় যে দেশভাবনার সুরটি থেকে থেকে বেজেই চলেছে—উপন্যাসের নিবিড় ঘটনাজাল আর

সূক্ষ্ম মনস্তত্ত্বের মাঝখানেও তার ছায়াপাত দেখতে পাই। আর দেশভাবনার মত একটি নিতান্ত আত্মগত চিন্তা ও মননের স্থান উপন্যাসে অবান্তর হলেও এর আবির্ভাবকে অপ্রত্যাশিত বলা যায় না। John Oakesmith যে কথা বলেছেন তাঁর 'Race and Nationality' গ্রন্থে—

"It is because literature—that clear record of national culture and tendency—best exhibits the operation of this process of general national development, that the writer has devoted a considerable space to the story of national literature in our own country".[১]

উনবিংশ শতাব্দীর যে লগ্নে বঙ্কিমচন্দ্রের আবির্ভাব যে যুগে তাঁর ধ্যান-ধারণা মনন ও চিন্তন রূপ নেওয়ার সময়—তাকেই আমরা রেনেসাঁর যুগ বলে থাকি। কাজেই দেশভাবনার স্বচ্ছতা তাঁর চরিত্রের সমস্ত দিককে উদ্ভাসিত করতে সাহায্য করেছিল বলেই উপন্যাসের মত নিতান্ত তন্ময় সাহিত্যেও উপন্যাসিকের ব্যক্তিচিন্তার প্রতিফলন পড়েছে অনায়াসে। শুধু বঙ্কিমচন্দ্র কেন, উপন্যাসের প্রাক্-বঙ্কিম যুগটিতে আমরা যে কজন উপন্যাসিককে আবিষ্কার করেছি—খুব আশ্চর্য ব্যাপার বলে মনে হলেও স্বদেশপ্রেমিকতা তাঁদের চরিত্রের অন্যতম প্রধান লক্ষ্যণীয় বৈশিষ্ট্য ছিল, স্বদেশভাবনা তাঁদের রচনার একটি বিষয় বলেই গৃহীত হয়েছিল।

কোনো বিশেষ ধরণের সাহিত্যের জন্মলগ্ন বিচার করার খুব একটা অসুবিধা নেই —কারণ যা ছিল না তার অনস্তিত্বের হেতু বিশ্লেষণ করলে খুব সহজেই তা নির্ণীত হতে পারে। বাংলা সাহিত্যে উপন্যাসের আবির্ভাব মুহূর্তটিকেও আমরা সহজেই বিশ্লেষণ করতে পারি। গদ্যের পথ বেয়ে অনায়াস ভঙ্গিতে প্রবন্ধ-রম্যরচনা-ব্যঙ্গ-প্রহসন-নাটিকা ও রীতিমত নাটক যখন বাংলা সাহিত্যের আসর জাঁকিয়ে বসেছে তখন একটি নিবিড় নিটোল গল্প শোনার প্রবৃত্তি যে খুব সহজেই জেগেছিল তা বোঝা যায়। অবশ্য নাটক ছিল.—গল্পাকারে উপদেশাত্মক কাহিনী ছিল, অনুবাদ গল্পও ছিল—কিন্তু সমগ্র জাতির মন খুঁজেছে সম্পূর্ণ অভিনব সাহিত্য, রোম্যান্স নিবিড় একটি জমাট কথাবস্তু,—যার গভীরে একক প্রবেশের বাধা নেই। সেই আকাঙ্ক্ষা থেকেই উপন্যাসের জন্ম। কাহিনীর রসাস্বাদন-উন্মুখ সুরসিক পাঠকরা তাই ভূদেব, হুতোম আর টেকচাঁদকে খুব সহজে আপন করে নিয়েছিল। এঁদের মধ্যে আবার একটু সূক্ষ্মভাগ দেখা যায়। চিন্তাশীল প্রাবন্ধিকের সুচিন্তিত কাহিনীধর্মী রচনাকে সে

১. John Oakesmith, Race and Nationality—An Enquiry into the Origin and Growth of Patriotism, London, 1919, Preface.

যুগের পাঠকরা সভয়ে এড়িয়ে গেছে—আর নিতান্তই আঞ্চলিক ভাষার বৈঠকী ভঙ্গিতে খানিকটা সংলগ্ন প্রায় অসংলগ্ন রচনার সঙ্গে পরিচিত হয়েছে গভীরভাবে। যদিও পূর্বেই বলেছি এ সব রচনার কোনটিকেই যথার্থ উপন্যাস বলা যাবে না। উপন্যাসের যে স্থূল লক্ষণ আমরা বঙ্কিমচন্দ্রের রচনায় পেয়েছি—ইতিপূর্বে কোনো রচনাতেই তা সুলভ ছিল না। বোধ হয় অনুবাদ রচনা বলেই 'অঙ্গুরীয় বিনিময়ের' মত একটি সম্ভাবনাপূর্ণ উপন্যাসের অস্বচ্ছ রূপকে সে যুগের রসিকেরা উপন্যাসের চোখে দেখেনি। আর স্বদেশপ্রেমের যে সহজ ধারাটি সে যুগের সমস্ত লেখকচিত্তকে প্রায় অধিকার করে বসেছিল,—উপন্যাসিকরাও তার হাত থেকে রেহাই পাননি। তাই দেখি জন্মলগ্ন থেকেই বাংলা উপন্যাসে অনেক বিচিত্র বক্তব্য পরিবেশিত হয়েছিল কিন্তু সেই সঙ্গে লেখক চিত্তের দেশানুভূতির একটা তীব্র প্রকাশ অনায়াসে ধরা পড়েছে। বঙ্কিমচন্দ্রের আগে শুধু মাত্র ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের রচনাতেই নয়,—নিতান্ত হাল্কা চালে লেখা অসংলগ্ন কথাবস্তুর মধ্যেও হুতোম কিংবা টেকচাঁদের স্বদেশপ্রেমের স্বতোৎসারিত প্রকাশ দেখি।

বাংলা উপন্যাসকে বয়ঃকনিষ্ঠ বলেছি—কারণ নাটকে-প্রবন্ধে-কাব্যে স্বদেশ ভাবনা যখন একটি সাধারণ ব্যাপার হয়ে গেছে তখনও উপন্যাসের আবির্ভাবই হয়নি। ১৮৫২ সালেই একাধিক পূর্ণাঙ্গ নাটকের জন্ম হয় কিন্তু ভূদেবের উপন্যাস লক্ষণাক্রান্ত 'ঐতিহাসিক উপন্যাস' গ্রন্থটির প্রকাশকাল তারও চার বছর পরে ১৮৫৬ সালে। 'আলালের ঘরের দুলাল'-এর সমকালীন রচনা হলেও মাত্র দু'বছর পরে প্যারীচাঁদ সম্পূর্ণ ভিন্ন আদর্শ ও উদ্দেশ্য নিয়েই "আলালের ঘরের দুলাল" [১৮৫৮] গ্রন্থটি প্রকাশ করেছিলেন। উপন্যাসে দেশপ্রেমের প্রতিফলন কোথায় কি ভাবে দেখা গেছে তার আবিষ্কার প্রসঙ্গে প্যারীচাঁদের গ্রন্থটির সাহায্য মিলবে না, কারণ দেশহিতৈষী বা সমাজদরদীর কলম থেকে যে সাহিত্য জন্ম নেয়, সেই সাহিত্যে যদি তাঁর স্বদেশভাবনার প্রতিরূপ না থাকে তবে বস্তুসন্ধানী আবিষ্কারকের খুবই অসুবিধায় পড়তে হয়। ভূদেবের 'ঐতিহাসিক উপন্যাসে' আমরা শুধু ঘটনা নিবিড় অন্তর্দ্বন্দ্ব-মথিত একটি অনূদিত কথাবস্তুই লাভ করিনি, স্বদেশপ্রেমিক ভূদেবের অন্তরে দেশচিন্তার একটি স্বচ্ছ ধারা প্রবাহিত হতে দেখেছি,—সেটিই আমাদের ঈপ্সিত বস্তু। তাই লেখক প্যারীচাঁদের সমাজ সংস্কারকের ভূমিকা থাকা সত্ত্বেও তাঁর রচিত নক্সাটিতে সমাজের একটি বাস্তব চিত্ররসই আমরা উপভোগ করেছি, কিন্তু ভূদেবের উপন্যাস আমাদের দেশচিন্তার অনুভাবনাটি জাগাতে সাহায্য করেছে। সেযুগের সামাজিক জীবনে ভূদেবের মনীষা ও দেশহিতৈষিতা প্রায় প্রবাদতুল্য সত্য বলেই পরিগণিত হয়েছিল, সেদিক থেকে প্যারীচাঁদ মিত্রের সুনামও বড় কম নয়। সামাজিক

আন্দোলনের সঙ্গে এঁরা ঘনিষ্টভাবে সংযুক্ত ছিলেন। বাংলাদেশের আন্দোলন ও প্রগতির ইতিহাসে এঁরা স্মরণীয় ব্যক্তিত্ব। দেশভাবনায় আন্দোলিত হতে পেরেছিলেন বলেই নানা কর্মে ও চিন্তায় এঁরা অনলস দেশপ্রেমিকতার পরিচয় দিয়ে গেছেন। "আলালের ঘরের দুলালে"—শুধু উপন্যাসের গুণই নেই,—সেযুগের গল্প বলার ভাষাটি ঠিক কেমন হওয়া উচিত তা নিয়েও গভীর চিন্তা করেছিলেন লেখক। কথ্য গদ্যের সাহায্য না নিলে আমাদের দৈনন্দিন জীবন-যাপনের কাহিনী পরিবেশন করা সম্ভব নয়, এ ধারণা থেকেই প্যারীচাঁদ কথ্য গদ্যসংলাপের আশ্রয় নিয়েছিলেন। ভূদেব-বঙ্কিম-রমেশচন্দ্রেরও বহু পরে দৈনন্দিন জীবনের ভাষায়ই উপন্যাসের কথাবস্তু পরিবেশন করার তাগিদ লাভ করেছি আমরা। বর্তমানে উপন্যাসের ভাষা কেমন হবে এ নিয়ে আমাদের আর কোন দ্বিধা নেই, প্যারীচাঁদের যুগে তা একটা প্রশ্নময় সমস্যা ছিল বৈকি? "আলালের ঘরের দুলালের" প্রত্যক্ষ আবেদন যাই হোক না কেন এর পরোক্ষ বক্তব্যটি স্বজাতিচিন্তা ও স্বসমাজচিন্তারই ফলাফল মাত্র। বাবুরামের পুত্র মতিলালের চরিত্রটি জীবন্ত করে উপন্যাসে তুলে ধরে লেখক বোধ হয় সমাজের চোখে আঙুল দিয়ে শিক্ষা ও অজ্ঞতার ভয়াবহতা বোঝাবার চেষ্টা করেছিলেন। এই চেষ্টার মূলে লেখকের গভীর সমাজদরদ প্রকাশ পেয়েছে বলেই ধারণা করি। দেশপ্রেমের অস্ফুট রূপ সমাজচিন্তার পথ বেয়ে কিভাবে উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠে, রামনারায়ণ তর্করত্নের নাটক প্রসঙ্গে সে আলোচনা আমরা করেছি কিংবা ঈশ্বরগুপ্তের সমাজচিন্তাজাত কবিতাগুচ্ছের বিস্তৃত আলোচনা থেকেও পরোক্ষ দেশপ্রেমের স্বরূপ আবিষ্কার করেছি। উপন্যাসের সম্ভাবনা যখন ঘনীভূত হতে চলেছে সেই লগ্নে উপন্যাসেও দেশপ্রেম কিভাবে অস্বচ্ছ ও অস্পষ্টাকারে ব্যক্ত হোত, 'আলালের ঘরের দুলাল' তারই দৃষ্টান্ত। প্যারীচাঁদের সাহিত্যকীর্তির মূল্যায়ন-প্রসঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্র লেখক-এর এই উদ্দেশ্যকেই অভিনন্দন জানিয়েছেন। বক্তব্যে প্রকাশিত না হলেও উদ্দেশ্যে যা আভাসিত হয়েছিল তাঁর যথোচিত মূল্য স্বীকার করে বঙ্কিমচন্দ্র বলেছিলেন,—

"তিনিই প্রথম দেখাইলেন যে, সাহিত্যের প্রকৃত উপাদান আমাদের ঘরেই আছে—তাহার জন্য ইংরাজী বা সংস্কৃতের কাছে ভিক্ষা চাহিতে হয় না। তিনিই প্রথম দেখাইলেনযে, যেমন জীবনে তেমনিই সাহিত্যে, ঘরের সামগ্রী যত সুন্দর, পরের সামগ্রী তত সুন্দর বোধ হয় না। তিনিই প্রথম দেখাইলেন যে, যদি সাহিত্যের দ্বারা বাংলা দেশকে উন্নত করিতে হয়, তবে বাঙ্গলা দেশের কথা লইয়াই সাহিত্য গড়িতে হইবে। প্রকৃত পক্ষে আমাদের জাতীয় সাহিত্যের আদি "আলালের ঘরের দুলাল"।[২]

২. বাংলা সাহিত্যে ৺প্যারীচাঁদ মিত্র, বঙ্কিম রচনাবলী। সমগ্র সাহিত্য ২য় খণ্ড। সাহিত্য সংসদ, কলিকাতা।

এই উচ্চ প্রশংসা স্বদেশপ্রেমিক বঙ্কিমচন্দ্রের পূর্বসূরীদের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা-বোধেরই ফল। গঠন পর্বের কিছু ত্রুটি ও অসম্পূর্ণতাকে স্বীকার করে সত্যিকারের গৌরবটুকু অর্পণ করার রীতিটিই বঙ্কিমচন্দ্র প্রয়োগ করেছেন এ ধরণের সমালোচনায়। কাজেই প্যারীচাঁদ আদি কথাসাহিত্যের উদ্ভাবক বলেই নন, উপন্যাসে সমাজচিন্তাকেই বড়ো করে স্থান দিতে পেরেছিলেন বলেই তাঁর কথা বিশেষভাবে স্মরণ করা দরকার। সমাজ ও সাহিত্যের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক স্বীকার করে বাংলাদেশের ঘরোয়া কাহিনী একসূত্রে গেঁথেছিলেন বলেই প্রথমযুগের ঔপন্যাসিকদের মধ্যে তাঁকে বিশেষ স্থান দেওয়া সঙ্গত হয়েছে। তাছাড়া সমগ্র জীবনের নানাকর্মে তিনি দেশহিতৈষিতার প্রমাণ রেখেছেন নানাভাবে। বহু সভাসমিতির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট থেকে আজীবন দেশের সেবা করে গেছেন তিনি। কর্মে ও জ্ঞানে যিনি দেশপ্রেমী তাঁর অমূল্যকীর্তি হিসেবে এই একটি মাত্র রচনাকেই স্মরণ করে প্যারীচাঁদকে সাহিত্যরসিকরা মনে রেখেছেন, এ ত সত্য কথা। জনপ্রিয়তায় তিনি সেযুগে অনেকেরই শীর্ষে ছিলেন। তাঁর মৃত্যুতে Hindoo Patriot' যে কথা বলেছিলেন তাও লক্ষ্যণীয়,—

"In him the country loses a literary veteran, a devoted worker, a distinguished author a clever wit, an earnest patriot, and an enthusiastic spiritual enquirer."[৩]

স্বদেশপ্রেমী প্যারীচাঁদের স্বদেশপ্রেম শুধুমাত্র তাঁর নক্সা রচনাতেই সীমাবদ্ধ ছিল না—তাই জীবনের নানাক্ষেত্রে তিনি তাঁর দেশসেবার চিহ্ন রেখেছেন।

ভূদেবের কিছুকাল পরে সাহিত্যিক প্যারীচাঁদের আবির্ভাব হলেও আলোচনার দিক থেকে তাঁকে অগ্রাধিকার দেবার একটু হেতু আছে। বাংলা সাহিত্যের আদি উপন্যাসকার হিসেবে টেকচাঁদ ও ভূদেব মুখোপাধ্যায়-এর নামোল্লেখ করা হয়ে থাকে। কিন্তু একই সঙ্গে একই প্রসঙ্গে দুটি নাম উচ্চারণে কিছু বাধা আছে। ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের "ঐতিহাসিক উপন্যাস" তাঁর মৌলিক রচনা নয়, কাহিনী তিনি সংগ্রহ করেছিলেন। কিন্তু 'আলালের ঘরের দুলালের' কাহিনী প্যারীচাঁদের নিজস্ব উদ্ভাবন। 'আলালের ঘরের দুলালে' যে চরিত্র সম্ভার সাজিয়েছিলেন তাতে উপন্যাসের বৈচিত্র্য অনেক বেশী পরিমাণে রয়েছে, বাবুরামের সংসারটিই প্রধানতঃ আলোচনায় স্থান পেয়েছে। এর একটা পৃথক গৌরব আছে। রচনারীতির উচ্চাঙ্গ গুণ হয়ত নেই—কিন্তু মৌলিকতায়,—উদ্দেশ্যের আন্তরিকতায় এ গ্রন্থের রচয়িতা প্যারীচাঁদই বোধ হয় অগ্রাধিকার পাবেন। অবশ্য ভূদেব

৩. সাহিত্য সাধক চরিতমালা। ২য় খণ্ড। প্যারীচাঁদ মিত্র থেকে উদ্ধৃত।

মুখোপাধ্যায়ের সহজ প্রবণতা ছিল দুটি সুন্দর নিটোল কাহিনীর সঙ্গে পাঠকের পরিচয় করিয়ে দেওয়া। কণ্টারের 'রোমান্স অব হিস্টরি' পড়েও অনেকেই আনন্দ পেতে পারেন,—ভাষান্তরিত করে ভূদেব তা সহজতর উপায়ে বহুজনের উপভোগ্য করে তুললেন। Rev. Hobart Caunter-এর Romance of History' গ্রন্থটি তিনটি খণ্ডে লেখা মনোরম ইতিহাস কাহিনী। কণ্টার এখানে ইতিবৃত্তকে কাজে লাগিয়েছেন কিন্তু গল্পরস পরিবেশন করেছেন মুখ্যভাবে। তিনটি খণ্ডে ভারত ইতিহাসের চমকপ্রদ ও মনোহর কাহিনীগুলো তিনি সাজিয়েছেন। ভূদেব প্রথম খণ্ডের প্রথম কাহিনী ও তৃতীয় খণ্ডের সর্বশেষ কাহিনীটির বঙ্গানুবাদ করেছিলেন। সুতরাং রচনাগুণে তা যতই সম্ভাবনাপূর্ণ হোক না কেন ভূদেব এখানে মৌলিকতার দাবী করতে পারেন না। সম্ভবতঃ ভূদেব তা জানতেন বলেই মৌলিক কাহিনী হিসেবে পৃথক কোন পরিচয়ই দেননি। তবে অনুবাদকের সহজ শক্তি দেখে অনুমান করা অসঙ্গত নয় যে ইচ্ছে করলে মৌলিক কাহিনী রচনা করেও ভূদেব বাংলা সাহিত্যের উপন্যাস শাখার সাড়ম্বর দ্বারোদ্ঘাটন করতে পারতেন। যে রচনা অনুবাদ হলেও লেখকের আত্মদর্শন ও জীবনদর্শনের বাণী সুষ্ঠুভাবে তুলে ধরেছে তাতেই ভূদেবের যথার্থ স্বকীয়তার পরিচয় মেলে। উপন্যাস রচনা করার একটা বিশেষ উদ্দেশ্য নিয়ে ভূদেব মুখোপাধ্যায় এ কাজে হাত দেননি। অথচ 'আলালের ঘরের দুলাল' প্যারীচাঁদ মিত্রের বিশেষ গবেষণার ফল বলতে হবে।

ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের প্রাথমিক পরিচয় প্রাবন্ধিক হিসেবেই। অনন্যসাধারণ ব্যক্তিত্ব ও সুতীব্র চিন্তাশক্তি নিয়ে ভূদেব মুখোপাধ্যায় সে যুগের বিদগ্ধ সমাজে আপন ক্ষমতায় স্থান লাভে সক্ষম হয়েছিলেন। প্রবন্ধ রচনায় ভূদেবপ্রতিভার বিস্ময়কর রূপ ধরা পড়েছে,—যথাসময়ে তা আলোচিত হয়েছে। স্বদেশচিন্তার যে প্রখর অনুভূতি, —স্বাজাত্যাভিমানের যে নিরহঙ্কার দর্প তাঁর রচনার গৌরব প্রবন্ধেই তা স্পষ্টভাবে ধরা পড়েছে। কিন্তু যিনি প্রাবন্ধিক তিনিই যখন কথাকার—একই অখণ্ড প্রতিভার দুটি রূপেই প্রবন্ধ ও উপন্যাসের জন্ম। তা ছাড়া রচনাকালের দিক থেকে আরও একটি বিষয় চোখে পড়ে। একই সময়ে প্রবন্ধ ও উপন্যাস তিনি রচনা করেছেন। তাঁর বিখ্যাত প্রবন্ধ গ্রন্থগুলোর জন্ম হয়েছে ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের পরিণত বয়সে। [১৮৫৬-৫৭] খ্রীষ্টাব্দে 'ঐতিহাসিক উপন্যাসের' সমসাময়িক রচনা হিসেবে ছাত্রপাঠ্য প্রবন্ধপুস্তক ও পুরাবৃত্তসার [১৮৫৮]-এর উল্লেখ পাওয়া যায়। প্রবন্ধ তাঁর স্বভাবজ সৃষ্টি ; তার মাঝখানে "ঐতিহাসিক উপন্যাস" ভূদেবের রচনাবৈচিত্র্যের সাক্ষ্য দেয় মাত্র। অথচ বাংলা সাহিত্যে উপন্যাসের অভাব থাকা সত্ত্বেও ভূদেব মুখোপাধ্যায় দ্বিতীয় কোন উপন্যাস রচনা করেননি কেন সেটাই আশ্চর্য। প্রাবন্ধিক হিসেবেই

তাঁর অসামান্য প্রতিষ্ঠা অথচ ঔপন্যাসিকের অনুভূতি ও অন্তর্দৃষ্টি তাঁর একটি মাত্র গ্রন্থেই পরিস্ফুট। চিন্তাশীলতা ঘনীভূত রূপে প্রবীণ লেখকের প্রবন্ধে প্রকাশিত হয়েছে,—কিন্তু ঐতিহাসিক উপন্যাসের রচনাকার ভূদেব পূর্ণযৌবনে ঐতিহাসিক চরিত্রগুলোর হৃদয় বেদনা, প্রেম-ভালবাসা, প্রাপ্তি ও ত্যাগের নিগূঢ় রহস্য নিয়ে ব্যস্ত ছিলেন, উপন্যাসের বিষয় হিসেবে যে ঘটনা তিনি বেছে নিয়েছিলেন তাতেও যথেষ্ট সূক্ষ্মদর্শিতার পরিচয় মেলে। আপাততঃ সে বিষয়ে যথেষ্ট আলোচনার অবসর না থাকায় আমরা উক্ত উপন্যাস দুটির মধ্যে স্বদেশপ্রাণ ভূদেবের দেশপ্রীতি কি ভাবে উচ্ছ্বসিত হয়ে ধরা পড়েছিল সে বিষয়ে আলোচনা করব।

ইয়ং বেঙ্গলের কর্ণধার মধুসূদনের পাঠ্যসঙ্গী ভূদেবের জীবনরীতির ভিন্নতা, আদর্শগত নিষ্ঠা থেকে সে যুগের পূর্ণচিত্রটি হৃদয়ঙ্গম করা আমাদের পক্ষে সম্ভব হয়েছে। ইংরাজের সভ্যতা ও সংস্কৃতির প্রতি অনুরাগ থাকার অর্থই যে স্বকীয়তা বিসর্জন নয়—এ সত্য ভূদেব মুখোপাধ্যায় জন্মগত সূত্রে লাভ করেছিলেন,—পারিবারিক ঐতিহ্যের প্রতি শ্রদ্ধা না হারিয়েও পাশ্চাত্য শিক্ষা গ্রহণে এতটুকু অসুবিধা হয়নি তাঁর। এই জীবনবোধ—স্বধর্ম ও স্বসমাজনিষ্ঠা ভূদেব চরিত্রের মূলধন। নানা পরিস্থিতির মধ্যে এই দৃঢ়নিষ্ঠা ও জলন্ত স্বাদেশিকতা কেবল বৃদ্ধিই পেয়েছে বলতে হবে। যে চরিত্রের গভীর তলদেশে শুধু এই বিশ্বাস ও আত্মবোধই প্রবল তার রচনায় সেই সুরটিই যে মুখ্য হয়ে উঠবে তা ত স্বাভাবিকই। ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের সম্পর্কে যে কোন আলোচনার সূত্র হিসেবে তাঁর ব্যক্তি চরিত্রের এই মহত্ত্বের প্রতি দৃষ্টি রাখতে হবে। চিন্তায়-কর্মে-ধ্যানে-মননে তিনি সে যুগের একটি দেশভক্ত সন্তান। এই দেশভক্তির রূপ শুধু মাত্র তাঁর রচনায় বা সৃজনেই প্রতিফলিত নয়—তাঁর জীবনধারার পরিমণ্ডলটিতে এই অনুভাবনা ছড়িয়ে আছে। পাশ্চাত্ত্য শিক্ষার আলোকে সেই অন্তর্নিহিত শক্তির স্ফুরণ ঘটেছে মাত্র। তিনি নূতন উদ্যমে স্বসমাজের ও স্বদেশের উন্নতির দিশারী হয়েছেন। তাঁর সম্বন্ধে যে কোন আলোচনায় তাঁর গভীর ও নিষ্ঠাপূর্ণ দেশচর্চার প্রসঙ্গটি আসে সবার আগে। কোন সমালোচক বলেছেন,

ভূদেব প্রকৃত হিন্দু, প্রকৃত স্বদেশপ্রেমিক, স্বর্গাদপি গরীয়সী জন্মভূমির উন্নতি সাধনে প্রকৃত চিন্তাশীল। এজন্য ভূদেব ধীরে ধীরে সেই মহিমান্বিত মহাজাতির অবলম্বনীয় কর্তব্য পথ নির্দেশ করিয়া দিয়াছেন।.....

কেহ কেহ তাঁহার প্রদর্শিত যুক্তির অনুমোদন না করিতে পারেন, কিন্তু তাঁহার বিদ্যাবুদ্ধি, লিপিক্ষমতা, বিচারপটুতা এবং তাঁহার হৃদয়ের সাধুভাবের বোধ হয়, কেহই

অনাদর করিবেন না। জ্ঞান গভীরতায়, স্বজাতি হিতৈষণায় তিনি চিরস্মরণীয় হইয়া থাকিবেন।[৪]

'ঐতিহাসিক উপন্যাস' রচনার কোনো সত্যিকারের ভূমিকা নেই, নেই কোন পূর্ব প্রস্তুতির ইতিহাস। বাংলা সাহিত্যে উপন্যাসের অভাব মোচনের উদ্দেশ্য হয়ত লেখকের ছিল কিন্তু কোথাও এ নিয়ে এমন কোন প্রসঙ্গ লেখক আলোচনা করেননি। তবে ইতিহাসপ্রীতিই যে উক্ত উপন্যাসদ্বয়ের সূচনা করেছিল এতে সন্দেহমাত্র নেই। কোনো সমালোচকের মতে,

"ইতিহাসের প্রতি এই প্রীতিপক্ষপাত ছিল বলেই ভূদেব যখন গল্প রচনায় প্রবৃত্ত হলেন তখন কাহিনীর জন্য ইতিহাসের দ্বারস্থ হয়েছিলেন।"[৫]

ভূদেব যে সময়ে ঐতিহাসিক উপন্যাস রচনা করেছেন সে যুগের শিক্ষিত বাঙ্গালী ভারত ইতিহাসের উজ্জ্বল অধ্যায়ের আলোচনায় গভীরভাবে মনোনিবেশ করেছিলেন। অতীতচর্চার সানুরাগ লক্ষণটি অবশ্য পাশ্চাত্ত্য শিক্ষারই ফলে ঘটেছিল। অতীতকে না জেনে বর্তমানে বাস করার চেষ্টা শিক্ষিত মনকে পীড়া দিয়েছিল। ইতিহাসবিহীন জীবনযাপনে কোন অসুবিধাই এককালে ছিল না। কিন্তু উনবিংশ-বিংশ শতকের শিক্ষিত বাঙ্গালীই প্রথম ইতিহাস অনুরাগের পরিচয় দিয়েছিল। জাতীয় জাগরণের মুহূর্তে ইতিহাসই ত একমাত্র দলিল—সেই প্রামাণ্য বক্তব্যটুকু কণ্ঠাগ্রে না থাকলে জনমানসের অভ্যন্তরে পৌঁছোনো যাবে না। এই সময়ের কিছু আগে রাজস্থানের বীরত্বপূর্ণ ইতিহাস অবলম্বনে টডের 'রাজস্থান' প্রকাশিত ও শিক্ষিত বাঙ্গালীর হাতে এসেছিল। তিন খণ্ডে লেখা কর্ণটারের 'রোমানস অফ হিস্টরিও' সাদরে গৃহীত হলো। বিদেশী রচিত এ দুটি গ্রন্থ চিন্তাশীল বাঙ্গালীসমাজ কিভাবে গ্রহণ করেছিলেন তার অসংখ্য উদাহরণ দেওয়া যায়। তাই বাঙ্গালীর আত্মজাগরণের পরোক্ষ উপাদান হিসেবে এ গ্রন্থ দুটিকে বিশেষ মর্যাদা দিতে হয়। নিছক ইতিহাস বর্ণনাই গ্রন্থ রচনার উদ্দেশ্য কিন্তু সেই ইতিহাসের অন্তর্নিহিত বক্তব্যটি যে অত্যন্ত সময়োচিত ও যুগধর্মী তা লেখক জানতেন। ইতিহাসের শিক্ষাকে জাতির জীবনে আরোপ করার সূক্ষ্ম উদ্দেশ্যটি আছে বলেই নিছক উপন্যাস হিসেবে বা ঐতিহাসিক কাহিনী হিসেবে বিচার না করে ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের জীবনাদর্শের প্রতীক হিসেবে এ রচনাকে গণ্য করতে হবে। প্রথম কাহিনীটি সম্পর্কেও এ কথা বিশেষভাবে মনে হয় যে, ধর্মলিপ্সু, নীতিবাদী ও ভগবদবিশ্বাসী ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের আন্তর পরিচয় গল্পটিতে যেন ফুটে উঠেছে। দ্বিতীয় কাহিনী সম্পর্কে আমাদের বক্তব্য আরও প্রসারিত। প্রথম

৪. রজনীকান্ত গুপ্ত, প্রতিভা ভূদেব মুখোপাধ্যায়, কলিকাতা, ১৮৯৬।

৫ বিজিতকুমার দত্ত, বাংলা সাহিত্যে ঐতিহাসিক উপন্যাস, ভূদেব মুখোপাধ্যায়, ১৯৬৩।

কাহিনীটি কণ্টারের 'The Traveller's Dream' অবলম্বনে রচিত, নামকরণেও ভূদেব স্বকীয়ত্ব বজায় রেখেছেন ;—পথিকের স্বপ্ন কি ভাবে সফল স্বপ্ন-এ রূপান্তরিত হয়েছে শুধু তার কারণ তিনি নির্দেশ করেছেন গল্পটিতে। ফলে ঐতিহাসিক বিবরণ ও উপন্যাসিকের মন্তব্য যুক্তভাবে গল্পটিতে পরিবেশিত হয়েছে। অনুল্লেখ্য রচনা হিসেবে বিবেচিত হলেও এ রচনায় লেখকের ব্যক্তিসত্তার প্রতিফলন পুরোমাত্রায় আছে। ঐতিহাসিক উপন্যাসের ভূমিকায় লেখক অবশ্য আগেই সচেতন করে দিয়েছেন সে বিষয়ে—

"গল্পচ্ছলে কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ প্রকৃত বিবরণ এবং হিতোপদেশ শিক্ষা হয় ইহাই এই পুস্তকের উদ্দেশ্য।"[৬] নীতিশিক্ষার বিষয় হিসেবে তিনি যে চরিত্রটি আমাদের সামনে তুলে ধরেছেন তার ভিত্তি যেমন ঐতিহাসিক তেমনি অবিশ্বাস্য হলেও বাস্তব। সুতরাং ধর্মপ্রাণতা—সদাশয়তার সাফল্য যে মানুষের জীবনে দেখা গেছে ভূদেব সে চরিত্রটি আমাদের সামনে এনেছেন। সম্ভবতঃ ধর্মাত্মা লেখক ধর্মাত্মা পথিকের চিত্রাঙ্কন করে আনন্দ পেয়েছিলেন। পথিকের চরিত্রে যথেষ্ট দৃঢ়তা ও সত্যনিষ্ঠা দেখা যায়,—তাছাড়া বীরোচিত গুণ ও আত্মবিশ্বাস চরিত্রটির মর্যাদা বাড়িয়েছে। দস্যুধৃত পথিক বিক্রীত হয়েছে হস্তান্তরের জন্য। দাসক্রেতা অর্থের বিনিময়ে বিক্রয় করার প্রসঙ্গে পথিককে প্রশ্ন করেছিল,—

"তুই স্বাধীন হইতে চাহিস কি না?

দাস উত্তর দিয়েছে—"স্বাধীনতা প্রাণীমাত্রের স্বতঃসিদ্ধ বস্তু, কেহ কাহাকে এই ধনে বঞ্চিত করিতে পারে না, আমিও সেই নিজস্ব অর্থ দ্বারা ক্রয় করিতে সম্মত নহি —তাদৃশ অধার্মিক জনের প্রবঞ্চনাতেই দুষ্ট লোকে দস্যুবৃত্তিতে প্রবৃত্ত হয় এবং দুর্ভাগ্য জনের স্বাধীনতা অপহরণ করে।" [সফল স্বপ্ন]

"স্বাধীনতা প্রাণীমাত্রের স্বতঃসিদ্ধ বস্তু"—পরাধীন দেশের অভ্যস্ত পরিবেশেও ভূদেব এ স্বতঃসিদ্ধ সত্যটি ভোলেন নি। অবশ্য মূল গল্পটিতে কণ্টার ঠিক এই ভাষায় ও ভঙ্গীতে বিষয়টির অবতারণা করেছিলেন। কণ্টারে আছে,—

Would you not be glad to enjoy your freedom? "I am not disposed to buy what is the blessed boon of Heaven, and of this you have no more right to deprive me than I have to cut your throat, which you well deserve, for being the encourager of knaves and supporter of brigands".[৭]

---

৬. ভূদেব রচনাসম্ভার, প্রথমনাথ বিশী সম্পাদিত, ১৩৬৪।

৭. Rev. Hobart Caunter—Romance of History (Vol-I), The Traveller's Dream, Calcutta, 1836.

ভূদেব-এর অনুবাদে এ বিষয়বস্তুটি যথাযথভাবে প্রতিফলিত হয়েছে,—মূল সুরটি ধ্বনিত হয়েছে অবিকৃতভাবে। সবক্তাগীনের "ধর্মাপরায়ণতা, জিতেন্দ্রিয়তা, নিরালস্য এবং স্বামীবাৎসল্যের" প্রতিদানই লেখক চিত্রিত করেননি,—স্বাধীনতালিপ্সু ও দৃঢ়চেতা একটি সার্থক মানুষের সাফল্যের কাহিনী শুনিয়েছেন।

দ্বিতীয় উপন্যাসটি ভূদেবপ্রতিভার একটি বিস্তৃত পরিচয় ব্যক্ত করে। প্রথম কাহিনী রচনায় ব্যক্তি ভূদেব এত বেশী প্রকট হয়ে আছেন যে বর্ণনার বিষয় বক্তার অস্তিত্বকে মুছে ফেলার সুযোগ দেয়নি। নিঃসন্দেহে এ ত্রুটি অমার্জনীয়। কিন্তু দ্বিতীয় রচনায় এ ত্রুটি চোখে পড়ে না। প্রথমতঃ এ রচনাটিতে কাহিনীগত জটিলতা বেশী, অন্তর্দ্বন্দ্বের বিশ্লেষণে লেখক অত্যন্ত নিপুণতার পরিচয় দিয়েছেন অথচ কোথাও আত্মপ্রকাশের চেষ্টামাত্র করেননি। পাত্রপাত্রীর হৃদয়বেদনার উত্তাল সমুদ্রে তাঁকে ডুবতে দেখেছি, ভাসতে দেখিনি ;—ভাসমান চরিত্র হিসেবে সামনে এসে দাঁড়িয়েছেন স্বয়ং নায়ক নায়িকা।

এ কাহিনীও কণ্টার রচিত 'The Mahratta Chief'-এর লেখক রচিত সংস্করণ হয়েছে—'অঙ্গুরীয় বিনিময়'। বাংলা সাহিত্যের প্রথম উপন্যাস হিসেবে 'অঙ্গুরীয় বিনিময়' সত্যিই স্থান দাবী করতে পারে এবং যুক্তি দিয়েও তা প্রমাণিত হতে পারে অনায়াসে। তবে পূর্বেই বলেছি—কাহিনীগত মৌলিকত্ব সৃষ্টির মূল দাবীটাই প্রথমে অগ্রাহ্য হবে।

এ কাহিনীতে রচনাশিল্পী ও কথাসাহিত্যিক ভূদেবের আত্মপ্রকাশ যেমন স্বচ্ছন্দ, দেশপ্রেমিক ভূদেবের আবির্ভাবও তেমনি অনায়াস। 'অঙ্গুরীয় বিনিময়ের' কাহিনী রচনায়ও ভূদেবের ব্যক্তিসত্তার স্বপ্ন ও আদর্শের সার্থক প্রতিফলন রয়েছে। কাহিনী ও ঘটনা, চরিত্র ও পরিবেশের সঙ্গে ঐক্যতান সৃষ্টি করে তা একটি সার্থকতর দৃষ্টান্ত সৃজন করেছে।

দেশপ্রেমিকতা ভূদেবের চরিত্রে আরোপিত কোন গুণ নয়, সহজাত। তাই যে কোন রচনায় দেশচিন্তা এমন স্বচ্ছন্দভাবে আত্মপ্রকাশ করতে পেরেছিল। 'অঙ্গুরীয় বিনিময়'-এর কাহিনী নির্বাচনে ভূদেবের একটি বিশেষ প্রবণতা লক্ষ্য করি। উনবিংশ শতাব্দীর জাগরণলগ্নে স্বদেশপ্রেমের মন্ত্রোচ্চারণে কবি ও নাট্যকার, প্রাবন্ধিক ও লেখক যখন উচ্চকণ্ঠ, দেশপ্রাণ ভূদেব তাঁর নবতর সৃষ্টিতেও সেই আকাঙ্ক্ষিত বাণীটুকুই প্রচারের চেষ্টা করেছিলেন। সমগ্র ভূদেবসাহিত্য আলোচনাতেও এ সত্যটি প্রমাণিত হবে। দেশপ্রেমের উদ্দীপনায় [১৮৫৮ খৃঃ] রঙ্গলাল যখন 'পদ্মিনী উপাখ্যান' রচনা করে বীরযুগের দ্বারোদ্ঘাটন করলেন তার ঠিক পূর্বমুহূর্তে স্বাধীনচেতা শিবাজীকে নায়করূপে কল্পনা করে ভূদেব 'অঙ্গুরীয় বিনিময়' রচনা করলেন। অবশ্য

এতে প্রমাণিত হয় না যে একে অন্যের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে একই সময়ে একই ভাবাদর্শের বাণীরূপ দিয়েছেন। জাতীয়তাবোধের জোয়ার এমনি করে সূক্ষ্ম রসিকদের মনপ্রাণ অধিকার করে থাকে। সেযুগের মনীষীরা নানা উপায়ে দেশভাবনাকে রূপ দেবার চেষ্টা করেছেন স্বতঃপ্রণোদিত হয়েই। মধুসূদনের উচ্ছ্বসিত দেশানুরাগের জন্য তিনি সমসাময়িকদের কাছে ঋণী একথা প্রমাণ করা কঠিন। প্রায় একই যুগে মধুসূদন, রঙ্গলাল, ভূদেব-এর আবির্ভাব, অথচ প্রত্যেকেই স্বকীয় মানসিকতার পরিচয় দিয়েছেন তাঁদের সৃষ্টিতে।

টডের 'রাজস্থান' থেকেই রঙ্গলাল 'পদ্মিনী উপাখ্যানের' প্রেরণা পেয়েছিলেন,—ভূদেব তার সাহায্য নেননি। কিন্তু ইংরেজ লেখকের রচনা থেকেই ভূদেব যে স্বদেশ-প্রেমের উপাদান খুঁজে পেয়েছিলেন তা ত অস্বীকার করা যাবে না। 'অঙ্গুরীয় বিনিময়' মারাঠাবীরের হৃদয়দানের আলেখ্যও বটে, আবার তাঁর বীরত্ব-স্বদেশপ্রেম-দৃঢ়চিত্ততার ইতিহাস বলেও গণ্য করা চলে একে। ভূদেব গল্পরসিক পাঠককে গল্প শুনিয়েছেন, ঐতিহাসিক উপাদান আরোপ করেছেন ইতিহাসপ্রিয় পাঠকের জন্য আর দেশপ্রেমের উচ্ছ্বসিত আবেগে যাঁরা আন্দোলিত—মারাঠাবীর শিবাজীর চরিতোপাখ্যান বর্ণনা করে তাঁদের উৎসাহিত করেছেন। যুগোপযোগী আবেদনে পূর্ণ এই কাহিনীটির অপরিসীম মূল্য এদিক থেকে রয়েছে। ভূদেবের চিন্তাধারার আন্তরিকতার প্রশংসা করেছেন সমালোচকগণ। "ঐতিহাসিক উপন্যাস" রচনায় এই আন্তরিকতা ও গভীর জীবনাদর্শের প্রতিফলন খুব স্পষ্ট। স্বদেশচিন্তায় নিমগ্ন লেখক এই রোমান্সনিবিড় কাহিনীটির মধ্যেও দেশপ্রেমিকতার পরিচয় দিয়েছেন।

প্রথমতঃ কাহিনীর নায়ক হিসেবে তিনি ভারত ইতিহাসের সংগ্রামী নায়ক শিবাজীকে নির্বাচন করেছেন। শিবাজীর শৌর্যবীর্য, বীরত্ব ও স্বাদেশিকতার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত উপন্যাসাকারে পরিবেশন করে তিনি যে স্বাধীন চিন্তাধারার পরিচয় দিয়েছিলেন সমসাময়িক কোন লেখকের রচনায় তা নেই। শিবাজী যুগ যুগ ধরে দেশবন্দিত গণনায়ক বলে বর্ণিত,—কিন্তু তাঁর কীর্তি কাহিনীকে বাঙ্গালীর সামনে উজ্জ্বলরূপে তুলে ধরার প্রথম চেষ্টা দেখি 'অঙ্গুরীয় বিনিময়ে'। শিবাজীর ঐতিহাসিক ব্যক্তিত্ব, নেতৃত্ব, দেশাদর্শের জন্য আমরণ সংগ্রামের চিত্র স্বল্পায়তনেও লেখক যথাসাধ্য চিত্রিত করেছেন অথচ শিবাজীর ব্যক্তি হৃদয়ের সুগভীর দ্বন্দ্বচিত্রটিও উপেক্ষিত হয়নি। কাহিনীর সৌন্দর্য ও আকর্ষণ বৃদ্ধি করেছেন অন্তর্দ্বন্দ্বের সুনিপুণ অধ্যায়টি রচনা করে।

'অঙ্গুরীয় বিনিময়'-এর সাহিত্যকীর্তির মূল্যায়ন আমাদের উদ্দেশ্য নয়, কিন্তু কাহিনীকার ভূদেবের ক্ষমতার পূর্ণ প্রকাশ হয়েছে এ রচনায়। বাদশাহপুত্রীর

অবরোধ-এর মতো একটি কৌতূহলজনক ঘটনা দিয়ে কথারম্ভ হয়েছে—নেপথ্য নায়কের কৌশলের পরিচয় দিয়ে ভূদেব আমাদের আকর্ষণ করেছেন। কিন্তু এই নেপথ্য নায়ক যখন প্রথম আমাদের সামনে এলেন ভূদেবের চাতুর্যপূর্ণ বর্ণনা পড়ে আমরা মুগ্ধ হই।

"এমন সময়ে হঠাৎ সেই গৃহদ্বার উন্মুক্ত করিয়া অদৃষ্টপূর্ব ব্যক্তিবিশেষ তাঁহার সম্মুখীন হইলেন। তাঁহার অনতিদীর্ঘচ্ছন্দ, প্রশস্ত ললাট এবং বক্ষ, বিশাল গ্রীবা এবং আজানুলম্বিত ভুজ প্রভৃতি সমুদয় বীর লক্ষণাক্রান্ত শরীর এবং সুন্দর ও সহাস্য মুখমণ্ডল, একাধারেই বীরত্ব এবং কমনীয়ত্ব গুণের প্রকাশ করিতেছিল। তাঁহার চক্ষুর্দ্বয়ের জ্যোতিঃ অতি তীব্র, বোধ হয় যেন তদ্দৃষ্টি সমুদায় প্রতিবন্ধক ভেদ করিয়া সকল বস্তুরই অভ্যন্তরে প্রবেশ করণে সক্ষম।···ঐ আগন্তুক ব্যক্তির অক্ষিদ্বয় দেখিলেই অতি প্রখর বুদ্ধি এবং তেজস্বী স্বভাব অনুমান হইত।"—কাহিনীর নায়ক শিবাজীর রূপবর্ণনায় ভূদেব সম্পূর্ণ নিজস্বভঙ্গীই আরোপ করেছিলেন, স্বাধীনতাযুদ্ধের নায়ক শিবাজীর রূপ বর্ণনায় লেখক যেন ধ্যানতন্ময়তা প্রাপ্ত হয়েছিলেন।

বাদশাহ ঔরংজীবের কন্যা অপহরণকালেও সদর্প আত্মঘোষণায় শিবাজী পরিচয় দিয়েছেন,—"আমি দস্যুবৃত্তি নহি। আমি এই পার্বতীয় দেশের স্বাধীন রাজা·· তৈমুরলঙ্গ প্রভৃতি যে সকল ব্যক্তি দিগ্বিজয় করিয়া দিগন্তবিশ্রুত নাম হইয়াছেন, তাঁহাদিগের বংশে জন্ম অপেক্ষা যিনি তাঁহাদিগের ন্যায় স্বয়ং সাম্রাজ্য সংস্থাপনে প্রবৃত্ত এবং সক্ষম, তিনি কি সহস্রগুণে প্রধান নহেন; আমি এই পর্বতোপরিস্থ প্রস্রবণ সদৃশ হইয়াছি, আমার মহারাষ্ট্র সেনা বেগবান নির্ঝরতুল্য হইয়া সমুদায় উপত্যকা আক্রমণ করিয়াছে, এবং অচিরকাল মধ্যে তৎকর্তৃক তাবৎ ভারতরাজ্য প্লাবিত হইবে। আমাকে তাবৎকাল জীবদ্দশায় থাকিতে হইবে না, কিন্তু আমি সেইদিন অদূরে দেখিতেছি, যখন মৎপ্রতিষ্ঠিত সিংহাসনোপবিষ্ট রাজগণ দিল্লীর রাজকোষ হইতেও করাকর্ষণ করিবে।" এই অংশের উদ্দীপনাময়ী ভাষা শিবাজীর ঐতিহাসিক ব্যক্তিত্বের পরিচায়ক হয়েছে ভূদেবের রচনাগুণে। এখানে মূল রচনা থেকে শুধু ভাবানুবাদ না করে ভূদেব খানিকটা স্বাধীনতা অবলম্বন করেছিলেন। মূলানুগত্য প্রদর্শন করলে এ অংশটি এমন আবেদনশীল হতে পারত না। ভূদেবের দৃষ্টি ছিল শিবাজীর চরিত্রমহিমার দিকে,—যত বাস্তব করে তা চিত্রিত করা সম্ভব তিনি তা করেছিলেন। মূল রচনায় এ অংশটি খুবই গতানুগতিক। শিবাজী আত্মপরিচয় দিতে গিয়ে বলছেন,—

"You mistake, lady; I am a sovereign in these mountain solitudes and all monarchs are equal in moral rights. The name of Sevajee

will be heard of among the heads of nations ; for who so renowned as the founders of kingdoms ?"

["The Mahratta Chief"—Romance of History.]

প্রণয়মুগ্ধ শিবাজীর আত্মবিবরণের প্রতিটি ছত্রে ভারত ইতিহাসের তেজস্বী মহানায়ক শিবাজী বারংবার আত্মপ্রকাশ করেছেন। তাঁর আত্মবিবরণের কোথাও উচ্ছ্বাস নেই—অহমিকা নেই—কিন্তু আদর্শনিষ্ঠার ও দৃঢ় প্রত্যয়ের গাম্ভীর্য আছে। শিবাজীর স্বপ্ন ও আকাঙ্ক্ষা যে ভবিষ্যতের ছবি কল্পনা করেছে অকপটে প্রথম সম্ভাষণ মুহূর্তেই শিবাজী রোসিনারার কাছে তা ব্যক্ত করেছেন। কারণ এতে কোন সংশয় নেই তাঁর চিত্তে। দৃঢ়প্রতিজ্ঞ সামান্য এক স্বাধীন পার্বত্যনেতা সোচ্চারে তাঁর নিষ্ঠা ও সংকল্পের কথা ব্যক্ত করেছেন। শিবাজীর মুখে এর চেয়ে সার্থক আত্মপরিচয় আর কি হতে পারে? ভূদেবও ধ্যানতন্ময় শিল্পী,—তিনি মুগ্ধচিত্তে ভারত ইতিহাসের তেজস্বী নায়ক শিবাজীকে চিত্রিত করেছেন।

শিবাজীও রোসিনারার পারস্পরিক আকর্ষণের সেতুরচনার উদ্দেশ্যে শিবাজীকে আরও উজ্জ্বলবর্ণে চিত্রিত করেছেন লেখক। রোসিনারার প্রণয়মুগ্ধ সৈন্যাধ্যক্ষকে দ্বৈতসংগ্রামে আহ্বান করে শিবাজী শক্তি ও প্রেমের পরিচয় দান করেছেন। উপন্যাসের জটিলতা সৃষ্টির দিক থেকেও এ অংশটি বিশেষভাবে সাহায্য করেছে। মৃতপ্রায় সৈন্যাধ্যক্ষের বিশ্বাসঘাতকতার সূত্র ধরে ঘটনাটি সহজ ভাবে এগিয়ে গেছে। মুসলমান সৈন্যদলে যোগদান করে শিবাজীর বিপক্ষতার চেষ্টা করার মুহূর্তে লেখক মারাঠাজাতির ইতিহাস বিশ্লেষণ করেছেন নিপুণভাবে। মারাঠা সৈন্যদের আত্ম-জাগরণের কারণ নির্ণয়ে ভূদেব নিপুণ বিশ্লেষণীশক্তির পরিচয় দিয়েছেন,—

"...সকল জাতিরই অভ্যুদয়কালে তত্তৎজাতীয় জনগণের ধর্মবুদ্ধি প্রবল হয়। এমন কি, সেই জাতীয় অতি নিকৃষ্ট—তামস-প্রকৃতি জনের মনেও কিঞ্চিৎ তেজস্বিতা প্রতীয়মান হইয়া থাকে। শিবাজীর সময়ে মহারাষ্ট্র দিগেরও সেইরূপ হইয়াছিল।"—কারণ বিশ্বাসঘাতক সৈন্যাধ্যক্ষও সদর্পে স্বীয় অভিসন্ধির কথা ব্যক্ত করেছে,—

"আমি অর্থলোভে জন্মভূমির অপকারে প্রবৃত্ত নহি, কেবল সেই দুরাত্মার শোণিত দর্শন করিতে চাহি।"—ভূদেব এই উক্তির মধ্যেও স্বদেশপ্রেম লক্ষ্য করেছিলেন ; নিকৃষ্ট-তামস-প্রকৃতি মানুষও দেশকে ভালবেসে স্বদেশবাৎসল্যের পরিচয় দিতে সক্ষম। ভূদেবের রচনায় সে যুগের লেখক সম্প্রদায়ের সাধারণ প্রবণতাটি ধরা পড়েছে। দেশপ্রেমিক রচনাকার বলেই এই অনুল্লেখ্য অংশগুলো এঁরা সযত্নে ব্যাখ্যা করেছেন। কোন জাতির প্রবণতার মধ্যে সবকিছুই প্রশংসনীয় নয়,—ভূদেব তাই মহারাষ্ট্রীয়দের চারিত্রিক দোষ ত্রুটিরও উল্লেখ করেছেন অকপটে,—

"মহারাষ্ট্রীয়েরা নিজ মহারাষ্ট্রখণ্ড উত্তীর্ণ হইয়া যুদ্ধ করিতে যাইত, তখনই পরদেশ বলিয়া প্রজামাত্রের প্রতি অত্যাচার করিত। কিন্তু স্বদেশে তাদৃশ অত্যাচারের লেশমাত্র ছিল না। তাঁহারা বাস্তবিক স্বদেশবৎসল ছিল। দেখ, ঐ দুষ্ট মহারাষ্ট্র সেনানী স্বদোষে দণ্ডিত হইয়া প্রভুর অপকারে প্রবৃত্ত হইল বটে, কিন্তু বিধর্মী শত্রুর স্থানে ভৃতি স্বীকার করিল না।"

এ অংশটি থেকে ভূদেবের স্বদেশানুভূতির পরিচয় ও উপন্যাসিক হিসেবে তাঁর আংশিক ব্যর্থতার হেতুটি আবিষ্কার করি অনায়াসে। তবু দেশবাসীর কাছে তাঁর আন্তরিক বক্তব্য ও উপদেশের অপরিসীম মূল্য অস্বীকার করা যায় না।

কৌশলী শিবাজী বিদেশীর হাত থেকে মাতৃভূমি রক্ষা করার মহান দায়িত্ব গ্রহণ করে প্রতি পদক্ষেপে শুধু বিপদ ও দুর্যোগ ডেকে এনেছিলেন কিন্তু মুহূর্তের জন্যও আত্মবিশ্বাস হারাননি। ঐতিহাসিকেরা শিবাজীকে বিভিন্ন দিক থেকে সমালোচনা করেছেন,—কিন্তু স্বাধীনতাকামী জাতীয়তাবাদী লেখকের কাছে শিবাজী শুধু আদর্শ পুরুষ,—একটি মহান ব্যক্তিত্বের আধার। শিবাজী বিশ্বাসহন্তা সেনানীকে দুর্গ জয় করে উদ্ধার করলেন—কিন্তু তাঁর পূর্বকৃত অপরাধ বিস্মৃত হয়েছেন বলেই দয়া ও মানবতার পরিচয় দিয়েছেন তাকে ক্ষমা করে। শুধু তাই নয়, শিবাজী বিদেশী যবনদের নিষ্ঠুরতার বীভৎস চিত্র দেখে অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হয়েছেন।—এই অত্যাচারের চিত্র তাঁকে শক্তি ও সাহস দান করেছে। শিবাজী সখেদে ভারতের দুর্দশার কথা ব্যক্ত করেছেন,—লেখকের দুঃখ-ভারাক্রান্ত অন্তরের পরিচয়ও যেন স্পষ্ট হয়েছে এখানে ;—

"হায়! ভারতভূমি আর কতদিন এই পাপাত্মাদিগের ভার বহন করিবে ?"

উনবিংশ শতাব্দীর সমগ্র বাংলাসাহিত্যে এই কথাটিই যেন সমস্ত কবি-নাট্যকার-রচনাকারদের ক্ষোভের বিষয় হয়ে উঠেছিল। যন্ত্রণার তীব্রতা যত বেড়েছে স্বাধীনতার আন্দোলনের সম্ভাবনা তত ঘনীভূত হয়েছে—কিন্তু ভূদেব প্রমুখ লেখকের দীর্ঘশ্বাসের করুণ আর্তনাদ সমগ্র মানুষের প্রাণেমনে একটি বিশেষ মনোভাবের জন্ম দিয়েছে।

লেখক এই প্রসঙ্গে জন্মভূমির মহিমা কীর্তন করেছেন। বিশ্বাসহন্তা সেনানী অনুতপ্ত হৃদয়ে ভবানীদেবীর তিরস্কার ও ভর্ৎসনা শ্রবণ করেছে,—বলাবাহুল্য ভূদেব যেন প্রতিটি দেশদ্রোহী মানুষের চেতনাসম্পাদন করেছেন এখানে,—

"রে নরাধম! তুই আমার বরপুত্র শিবাজীর অপকারে প্রবৃত্ত হইয়াছিস—তুই নিজ জন্মভূমির প্রতিও স্নেহ বিবর্জিত হইয়া তাহা বিধর্মী শত্রুর হস্তগত করিলি—জানিস না গর্ভধারিনী মাতা, আর পয়স্বিনী গো এবং সর্বদ্রব্যপ্রসবা জন্মভূমি—এই

তিনই সমান। যে জন্মভূমির অপকার করিতে পারে, সে গোবধ ও এবং মাতৃহত্যাও করিতে পারে।"

'অঙ্গুরীয় বিনিময়' উপন্যাসের সাহিত্যমূল্য বিচারের প্রসঙ্গ এখানে অবান্তর কিন্তু এ রচনায় ভূদেবের আন্তরিক উদ্দেশ্যের স্বরূপটি ধরা ছড়েছে। সে যুগের প্রথম উপন্যাস রচনার চেষ্টা করেছিলেন তিনি—কিন্তু উপন্যাসের বক্তব্যটি শুধু মাত্র গল্প-রসিক পাঠকেরই মনোরঞ্জন করুক তা তিনি চাননি। রেঁনেসার চকিত আলোক যে সব শিক্ষিত-বুদ্ধিজীবী-সপ্রতিভ প্রাণকে আলোকিত করেছিল ভূদেবের উদ্দেশ্য ছিল তাঁর বক্তব্য তাঁদের কাছে পৌঁছে দেওয়া। শুধু নতুন রচনার আনন্দে আত্মহারা হয়েই তিনি তৃপ্ত নন,—তাঁর ভাবনার বিশুদ্ধ আবেদন যদি রসিকের-দেশপ্রেমিকের উৎসাহ জাগাতে না পারে তবে ত সৃষ্টির উদ্দেশ্যই অর্থহীন হয়ে যাবে। এ প্রচেষ্টা রচনাটিতে সর্বত্র প্রকট।

এ কাহিনীতে ভূদেব নির্বিচারে ইতিহাসের ঘটনা আবৃত্তি করেননি,—মারাঠা বীর শিবাজীর স্বপ্ন ও আদর্শ বিশ্লেষণ করেছেন নিপুণভাবে। হিন্দু হয়েও জয়সিংহ মোঘল সেনাপতিত্ব লাভ করেছেন, রাজপুতের বিশ্বস্ততা ও বিশ্বাসঘাতকতার পাশাপাশি চিত্র একই সঙ্গে ইতিহাসে বর্ণিত হয়েছে। মারাঠার ইতিহাসে সে দৃষ্টান্ত নেই, এই তার গৌরব। জয়সিংহ সেই রাজপুতের প্রতিনিধি, তিনিই যখন শিবাজীর সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন—ভূদেব সেই সুযোগে শিবাজীর মহত্ব ও জয়সিংহের দুর্বলতার আলোচনা করেন। মূল কাহিনী ও ঘটনা অসম্পৃক্ত হলেও লেখক দেশপ্রীতির যথার্থ স্বরূপ বিচার করতে চান বলেই এ অংশ যোজনা করেছেন। উপন্যাসের দাবী আর উপন্যাসিকের উদ্দেশ্য দুটিই সার্থক ভাবে যোজনা করার কৌশল নেই বলে আক্ষেপ হয় বটে কিন্তু বিশ্লেষণী শক্তির নিপুণ পরিচয় রেখেছেন বলে লেখককে খুব বেশী দোষারোপ করতে পারি না। উদ্দেশ্যমূলক রচনাংশ বলেই এর বিচার করা দরকার। শিবাজী বিপক্ষ সেনাপতির কাছে এসেছেন দুরাশা নিয়ে,—সাহসী ও দূরদর্শী শিবাজী বিপদের ঝুঁকি নিতে পেরেছেন কারণ তিনি ঐক্যবদ্ধ হয়ে বিদেশীশক্তির হাত থেকে মাতৃভূমির স্বাধীনতা রক্ষা করতে চান।

শিবাজী যে আবেদন নিয়ে জয়সিংহের কাছে এসেছিলেন—সমগ্র ভারতবাসীদের একতাবদ্ধ হওয়ার আবেদনের সঙ্গে তার পার্থক্য খুব বেশী কিছু নেই। দেশপ্রেমী লেখক এখানে সঙ্ঘশক্তির মহিমা বোঝানোর চেষ্টা করেছেন শিবাজীর উক্তির মাধ্যমে। শিবাজী শত্রু হলেও নির্ভয়ে এসেছেন জয়সিংহের কাছে কারণ জয়সিংহ বিপক্ষদলে যোগ দিয়েছেন বটে, তিনি ধর্ম হারাননি, ঐতিহ্যও হারাননি। বাকচাতুর্য দিয়ে শিবাজী জয়সিংহের সেই লুপ্ত আত্মমহিমা জাগানোর একটি আন্তরিক চেষ্টা

করেছেন মাত্র। শিবাজী ধর্ম ও একজাতিত্বের দাবী নিয়ে আবেদন করেন,—এখানেও তার দূরদর্শিতার পরিচয় পাই।—শিবাজী বলেন,

"আমরা যেমন উভয়ে এক ধর্মাবলম্বী, এক জাতির এবং [বোধ হয় আপনি জানেন] এক গোত্রোদ্ভব, তেমনই আশা করি, উভয়েই এক পরামর্শী ও এককর্ম হইব। মহারাজ! আমাদিগের একত্র মিলন হইলে উভয়ের মঙ্গল। যাহাতে জাতীয় ধর্ম রক্ষা হয়, দেশের মুখ উজ্জ্বল হয়, এবং অন্য সর্বজাতির নিকট হিন্দু নামটি অবজ্ঞাস্পদ না হয়, এমত কর্ম কি কর্তব্য নহে? দেখুন দেখি, দিল্লীশ্বর কেমন মন্ত্রণা করিয়া আমাদিগের অনৈক্যকেই আমাদের অনর্থের মূল করিতেছেন।···আমি আর পরস্পর যুদ্ধে স্বজাতির বিনাশ অবলোকন করিতে পারি না।"

উদ্ধৃত উক্তি থেকে শিবাজী চরিত্রের গভীরে প্রবেশ করতে পারি অনায়াসে; বিপজ্জনক হলেও তিনি একাকী বিপক্ষশিবিরে এসে জয়সিংহকে দেশের কথা জাতির কথা, মুক্তির পরামর্শ শোনাতে এসেছিলেন। অনৈক্য ও পারস্পরিক বিবাদ-বিসম্বাদ কিভাবে আমাদের সর্বনাশ সাধন করছে—শিবাজী তার স্বরূপ উদ্ঘাটন করেছেন। জয়সিংহ যে একথা জানেন না তা নয় কিন্তু মোহগ্রস্ত দাস যেমন দাসত্বেই স্বস্তি পায় —স্বাধীন চিন্তায় অস্বস্তি অনুভব করে, জয়সিংহের অবস্থাও ঠিক তাই। শিবাজী তার চেতনা সম্পাদনের একটা চেষ্টা করেছেন মাত্র। দীর্ঘবক্তৃতায় শিবাজী মোঘল সম্রাটের পরিকল্পনারও নিখুঁত চেহারা উপস্থিত করেন। সমগ্র ভারতের উচ্চকাঙ্ক্ষী —স্বাধীনতাকামী মানুষের সম্মিলিত চেষ্টায় বিদেশী যবন বিতাড়ন করা সম্ভব, এই সম্ভাবনার ইঙ্গিত যে কোন জড় ব্যক্তির মনেও উৎসাহ জাগাবে। হিন্দু শক্তির ক্ষীয়মান অবস্থা দেখে শিবাজীর মর্মবেদনার গভীরে প্রবেশ করেছেন লেখক,—

"আমার এই প্রার্থনা, যেন এমনদিন কখনও উপস্থিত না হয় যে, কোন বাদসাহ হিন্দু জাতির মধ্যে সক্ষম ব্যক্তি নাই বলিয়া অবজ্ঞা করেন। মহারাজ! যাহারা আপনারাই এই জাতিকে নিস্তেজ করিয়া পরে ক্ষীণবীর্য বলিয়া অবজ্ঞা করেন, তাঁহাদের কি সাধারণ দুষ্টতা! মহারাজ! অধুনা ভারতরাজ্যের যে অপেক্ষাকৃত নিরুপদ্রবাবস্থা দৃষ্ট হইতেছে, সে বিকারাপন্ন রোগীর দৌর্বল্যাধীন নিস্পন্দ হওয়ার ন্যায় —তাহা সুষুপ্তি-সুখানুভব নহে।

ভূদেব অতি আন্তরিকতার সঙ্গে ভারত ইতিহাসের স্বাধীন নায়ক শিবাজীর পূত চরিত্র রচনা করেছেন। উনবিংশ শতাব্দীর নবজাগরণের লগ্নে মারাঠা জাতির স্বাধীনতা সংগ্রামের চিত্র উপস্থাপিত করার পেছনেও ভূদেবের বিশেষ উদ্দেশ্য ছিল। পরবর্তীকালে ইতিহাসের দুটি বিশিষ্ট অধ্যায় নিয়ে ঔপন্যাসিক রমেশচন্দ্র দত্ত সমগ্র জাতির সামনে দুটি পৃথক চিত্র তুলে ধরেছেন, একটি 'রাজপুত জীবনসন্ধ্যায়'

ও অপরটি 'মহারাষ্ট্র জীবন প্রভাত'-এ, ভূদেবই মারাঠাবীর শিবাজীর আদর্শ সর্বপ্রথমে আমাদের শুনিয়েছেন। জয়সিংহ বহু অভিযানের অধিনায়কত্ব করেছেন—কিন্তু দাক্ষিণাত্যের জাগরণ মুহূর্তে এ অভিজ্ঞতা তিনি প্রথম অর্জন করলেন। রাজপুত ইতিহাসে প্রতাপসিংহ যেমন উজ্জ্বল নক্ষত্র, মানসিংহ-জয়সিংহ-যশোবন্তসিংহ তেমনই সে উজ্জ্বল ইতিহাসের বুকে কালিমা লেপন করেছেন। শিবাজী জয়সিংহের চেতনা সম্পাদনে সমর্থ হয়েছিলেন অবশেষে। দেশরক্ষা ও স্বাধীনতারক্ষার জন্য শিবাজী মৃত্যুপণ করেছেন, জয়সিংহ তা দেখে উচ্ছ্বসিত হয়ে বলেন,—

"এমত সাহস না হইলে কি কেহ সাম্রাজ্য সংস্থাপনে সক্ষম হয়! এমন কার্যপরতন্ত্র না হইলেকি মহৎ কার্য সিদ্ধ হয়!"—ভূদেবও এখানে মুখর হয়ে ওঠেন। পাশ্চাত্ত্য ইতিহাসবেত্তারা শিবাজীচরিত্রের দোষত্রুটি নির্ণয় করেছিলেন,—কিন্তু ভূদেব তাঁকে দেখেছেন মুগ্ধ দৃষ্টিতে, এই মুগ্ধতা এসেছে নানা কারণে। বীর্যহীন-আশাহীন জাতির সামনে তিনি একটি উজ্জ্বল চিত্র অঙ্কনের চেষ্টা করেছেন,—তাঁর চরিত্রের মহত্ত্ব উদ্ঘাটনই লেখকের উদ্দেশ্য হয়েছে। ভূদেব বলেছেন,—

"মহারাষ্ট্রপতি বাস্তবিক সরলপ্রকৃতি ছিলেন। তিনি সহজে কপট ব্যবহার করিতেন না। তিনি অত্যুদার প্রকৃতি না হইলে কখন মহারাষ্ট্রীয়দিগের অন্তঃকরণে প্রবল স্বদেশহিতৈষিতা উদ্রিক্ত করিতে পারিতেন না। কিন্তু তাঁহাকেও মধ্যে মধ্যে কৌটিল্য অবলম্বন করিতে হইত। এইজন্য তাহার চরিত্র লেখক গ্রন্থকার অনেকেই এই মহাত্মাকে কুটিল স্বভাব বলিয়া বর্ণন করিয়া গিয়াছেন।"—স্পষ্টতই বোঝা যায় ভূদেবের এতে যথেষ্ট আপত্তি রয়েছে। শিবাজীকে যিনি স্বাধীনতার মূর্তপ্রতীক রূপে কল্পনা করেছেন তাঁর চরিত্রের এই কৌটিল্যের মধ্যেও তিনি সুষমা আরোপ করেছেন। কোন সমালোচকও বলেছেন,—

"ভূদেব যে স্বাধীনতার স্বপ্ন দেখেছিলেন সে স্বাধীনতা শিবাজীর উক্তিতে রয়েছে। গ্রন্থমধ্যে শিবাজীর চরিত্রটির ওপরই নানাদিক দিয়ে আলোকপাত করা হয়েছে।...প্রধান হয়েছে শিবাজীর আদর্শ, উচ্চাকাঙ্খা, কৌশল। সবমিলে শিবাজী আদর্শবাদের এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত হয়ে দেখা দিয়েছেন।[৮] ভূদেবের দেশপ্রীতি শিবাজীকে অকলঙ্ক দেশনায়ক রূপে প্রতিষ্ঠা দিয়েছে। কন্টার মারাঠা জাতির অভ্যুদয়কে নিরপেক্ষ ভাবে বর্ণনা করেছেন গল্পটিতে,

"The rise of the Mahratta Power in India was one of those sudden and surprising revolutions which, amid the troubled

৮ বিজিত কুমার দত্ত, বাংলা সাহিত্যে ঐতিহাসিক উপন্যাস, 'বঙ্কিমচন্দ্র', ১৯৬৩।

currents of political events, have been so frequently seen to spring from the reactions of despotism."

'অঙ্গুরীয় বিনিময়' উপাখ্যানটির শেষাংশে রোসিনারার অন্তর্দ্বন্দ্বচিত্রটি প্রাধান্য পেয়েছে,—শিবাজীর প্রণয়মুগ্ধা রাজপুত্রী জীবনমন সমর্পণ করার পূর্বে বৃদ্ধশাজাহানের কাছে পরামর্শ গ্রহণ করেছে। মারাঠাবীর যে উদ্দেশ্য নিয়ে রোসিনারাকে হরণ করেছিলেন,—তা পূর্ণ হতে চলেছে। কিন্তু আরঙজেব তা হতে দেননি। ইতিহাসের কলঙ্কিত নায়ক ও ক্ষমতাবান আরঙজেব শিবাজীকে যোগ্য মর্যাদা দেননি বলেই পলায়নের পথই বেছে নিতে হয়েছিল তাঁকে। রোসিনারাই অঙ্গুরী বিনিময় করে বিশ্বস্ততার ও চিরবিরহের পথ বেছে নিয়ে গল্পটিতে একটি করুণগাম্ভীর্য্যের অবতারণা করেছে। এ উপন্যাস বাংলাসাহিত্যের প্রথম কথাসাহিত্য রূপে পরিগণিত হওয়ার প্রধান বাধা রচনার মৌলিকত্বের অভাব। কিন্তু প্রথম উপন্যাসের মর্যাদাবঞ্চিত এই রচনাটিতে স্বদেশপ্রেমিক ভূদেবের যে পরিচয় লাভ করেছি তা এককথায় অনন্যসাধারণ। কথাসাহিত্যের বিষয়বস্তুরূপে নিছক প্রেম বা নিছক রোম্যানসকে তিনি নির্বাচন করেননি। লেখকের আজীবনের সাহিত্য সাধনার ইতিহাস আলোচনা করলে তার উত্তর পাওয়া যায়। তাঁর মত চিন্তাশীল লেখকের পক্ষে নিছক গালগল্প রচনা করা কোনমতেই সম্ভব ছিল না। কণ্টারের মনোরম ঐতিহাসিক কাহিনীমূলক গ্রন্থ পাঠকালে কৌতূহলবশতঃ তিনি অনুবাদকের দায়িত্ব নিয়েছিলেন—কিন্তু সেখানেও দেখি নির্বাচনে যথেষ্ট সাবধানতার পরিচয় দিয়েছেন। কোনো কোনো সমালোচক ভূদেবের নীতিনিষ্ঠার প্রসঙ্গটি বড়ো করে দেখেছেন—কিন্তু মনে হয় নীতিনিষ্ঠার চেয়েও ভূদেবের স্বজাতি, স্বধর্ম ও স্বদেশনিষ্ঠতার পরিচয় আরও নিবিড়। প্রাবন্ধিক হিসেবে ভূদেবের স্বসমাজ নিষ্ঠার পরিচয় খুবই স্পষ্ট—কিন্তু অনুবাদকের দায়িত্ব সুষ্ঠুভাবে পালনের চেষ্টা করেও 'অঙ্গুরীয় বিনিময়ে' ভূদেব তাঁর সুগভীর দেশনিষ্ঠার পরিচয় দিয়েছেন, সেটাই আশ্চর্য।

বাংলা সাহিত্যের প্রথম সার্থক ঔপন্যাসিক বঙ্কিমচন্দ্রকে বহু অভিধায় ভূষিত করা হয় শুধু তাঁর অনন্য সাহিত্য সৃষ্টিকে অভিনন্দিত করার জন্যই নয়—বঙ্কিম মনীষার বিভিন্ন দিককে পাঠক সাধারণের কাছে তুলে ধরার একটা উদ্দেশ্যও সেখানে বর্তমান, তাই তাঁকে সাহিত্যসম্রাট বলে উল্লেখ করা হয়। সার্থক কথাশিল্পী হলেও তিনি সার্থকতর সমালোচক,—সর্বোপরি দেশ ও জাতির কল্যাণকামী নায়ক বঙ্কিমচন্দ্রকে একনিষ্ঠ স্বদেশপ্রেমিক বলে আমরা তৃপ্তি পাই। আসলে বঙ্কিমচন্দ্রের অসংখ্য গুণাবলী তাঁর রচনায় এমনভাবে প্রকাশিত হয়েছে যে তাঁকে শুধু একটি নামে চিহ্নিত করাই যায় না। বাংলা উপন্যাসে তাঁর অনন্য সাধারণ প্রতিভার স্বাক্ষর রয়েছে,

সর্বপ্রথম উপন্যাস থেকে সর্বশেষ উপন্যাসেও বঙ্কিম প্রতিভা সাফল্য অর্জন করে ধন্য হয়েছে। কিন্তু এই উপন্যাসসম্ভার পাঠ করে বঙ্কিমচন্দ্রকে শুধুমাত্র শ্রেষ্ঠ ঔপন্যাসিক কিংবা সার্থক ঔপন্যাসিক হিসেবে বিচার করলেই সব কর্তব্য শেষ হয় না। বঙ্কিম উপন্যাসের স্তরে স্তরে বঙ্কিম প্রতিভার বিচিত্র রূপ প্রকাশ পেয়েছে,—সে প্রসঙ্গটিও আলোচনার পক্ষে অপরিহার্য হয়ে ওঠে। বঙ্কিম মনীষার গভীরে প্রবেশ না করলে যেমন তাঁর সৃষ্ট চরিত্র, কাহিনী কিংবা মনোবিশ্লেষণের সঠিক অর্থ নির্ণয় করা যায় না তেমনি সে যুগের দেশানুরাগের স্পর্শ কি ভাবে বঙ্কিমচিত্তকে আলোড়িত করেছিল তাঁর পূর্ণ পরিচয় পেতে হলে উপন্যাসের দ্বারস্থ হতেই হয়। প্রবন্ধে, রসরচনায়, সমালোচনায় প্রকাশ্যভাবে দেশাত্মবোধের বাণী প্রচার করেছেন তিনি—কিন্তু উপন্যাসের ঘটনাজাল ও নিবিড় অন্তর্দ্বন্দ্বের মাঝখানেও দেশপ্রেমের অনুভবটি তিনি অবিচ্ছিন্নভাবে প্রকাশ করে গেছেন—এও বঙ্কিম প্রতিভার একটি বিস্ময়কর পরিচয়। দেশচিন্তার ক্ষেত্রে বঙ্কিমচন্দ্রের অনন্যতা আছে, কিন্তু এর পেছনে রয়েছে দীর্ঘদিনের ভূমিকা। বাংলা দেশের আকাশে বাতাসে দেশপ্রেমের বাণী যখন ধ্বনিত-প্রতিধ্বনিত-উচ্চারিত-নিনাদিত—সেই পর্বেই বঙ্কিমচন্দ্রের আবির্ভাব। একটা নিখুঁত হিসেব নিলে দেখতে পাবো যে, বাংলা নাটকে, কাব্যে প্রবন্ধে দেশপ্রেম প্রসঙ্গ যখন একটি সাধারণ আলোচনার বস্তু, যে অনুভবটি বাংলা সাহিত্যকে প্রায় আচ্ছন্ন করে ফেলেছে—অথচ যে কথা বলার অপরিসীম প্রয়োজন তখনও ফুরিয়ে যায়নি সেযুগেই দেশপ্রেমকে একটা মূর্তি দেবার তাগিদে বাংলার সাহিত্যাকাশে বঙ্কিমচন্দ্রের উদয় হয়েছে। ঈশ্বরগুপ্ত—রঙ্গলাল—মধুসূদন—দীনবন্ধু—অক্ষয়কুমার—দেবেন্দ্রনাথ—ভূদেবের স্বপ্ন ও সাধনায় যে সত্য বারংবার আমাদের চেতনার দ্বারে ঘা দিয়েছে, বঙ্কিম সেই বাণীটিই একান্তভাবে গ্রহণ করেছেন। সমগ্র বঙ্কিমসাহিত্য আলোচনা করলেও দেখা যাবে সব ভাবনার শেষে দেশপ্রেমিক বঙ্কিম-চন্দ্রের একটি নিজস্ব বক্তব্য আছে। উপন্যাসে যে কথা উপরন্তু, যে প্রসঙ্গ অতিরিক্ত বলে সমালোচনার যোগ্য—সে কথাটি বলার জন্য বঙ্কিমের এত আকুলতা কেন? সাহিত্য কি, উপন্যাসের উপপাদ্য কি,—এ তথ্য শিক্ষিত ও সূক্ষ্মদর্শী বঙ্কিমের অজানা ছিল না। তবু তিনি কাহিনী ও ঘটনার অন্তরালে নিজেকে গোপন করতে অসমর্থ হয়েছেন এবং তাঁর বিশিষ্ট উপলব্ধির কথাটি না শুনিয়ে শান্তি পাননি। সাহিত্য শুধুমাত্র কলারসিক ও সূক্ষ্মরসিকের মনোরঞ্জনের বস্তু নয়, সাহিত্য সৃজনের দায়িত্ব যে কত নিষ্ঠাপূর্ণ কর্তব্য, সেকথা বঙ্কিমচন্দ্রই প্রথম স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন। সাহিত্য-সেবীর শুধু আত্মগত ভাব-বিলাস নিয়ে মগ্ন থাকা চলবে না, সাহিত্যের দর্পণে ফুটিয়ে তুলতে হবে চলমান জীবনযাত্রার নিখুঁত ছবি,—আর সেই ছবিটি দেখে শুধু আনন্দ

পেয়েই তৃপ্ত হওয়া চলবে না,—যা আমাদের চিন্তাশক্তিকেও জাগিয়ে তুলতে সাহায্য করবে তাই হবে সাহিত্যপদবাচ্য। এমন চিন্তাশীল লেখকের কলম থেকে উপন্যাস কিংবা রস রচনা প্রকাশিত হলেও লেখকের চিন্তাশীলতার বিশিষ্ট স্পর্শ সে রচনায় থাকবেই। "উত্তররামচরিতে" বঙ্কিমের বক্তব্য,—"অনেক পাঠকেরই এইরূপ সংস্কার যে, ক্ষণিক চিত্তরঞ্জন ভিন্ন কাব্যের অন্য উদ্দেশ্য নাই। বস্তুতঃ অধিকাংশ কাব্যে [বিশেষতঃ গদ্য কাব্যে বা আধুনিক নবেলে] এই চিত্তরঞ্জন প্রবৃত্তিই লক্ষিত হয়—তাহাতে চিত্তরঞ্জন ভিন্ন গ্রন্থকারের অন্য উদ্দেশ্য থাকে না; এবং তাহাতে চিত্তরঞ্জনোপযোগিতা ভিন্ন আর কিছু থাকেও না। কিন্তু সে সকলকে উৎকৃষ্ট কাব্য বলিয়া গণা যাইতে পারে না।" [উত্তররামচরিত, বিবিধ প্রবন্ধ]

এমন স্পষ্ট সমালোচনা যে মানুষের চিন্তাকে সর্বদাই প্রভাবিত করেছে তিনি নিছক রসবিতরণের তাগিদে কলম ধরতে পারেন না। তাই ঔপন্যাসিক বঙ্কিম যে কর্তব্য পালনের জন্য লেখনী ধারণ করলেন তা তাঁর নিজের কথাতেই বলি,—

"কাব্যের গৌণ উদ্দেশ্য মানুষের চিত্তোৎকর্ষ সাধন—চিত্তশুদ্ধি জনন। তাঁহারা সৌন্দর্যের চরমোৎকর্ষ সৃজনের দ্বারা জগতের চিত্তশুদ্ধি বিধান করেন। এই সৌন্দর্যের চরমোৎকর্ষের সৃষ্টি কাব্যের মুখ্য উদ্দেশ্য।" [ঐ]

এই মন্তব্যের আলোকে বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাস রচনার আদর্শবিচার করার সুবিধে রয়েছে। বিশেষতঃ বঙ্কিমচন্দ্র আধুনিক নবেল সম্পর্কে যে অভিযোগ এনেছেন,—সে অভিযোগ তাঁর নিজের রচনা সম্পর্কে প্রযুক্ত হতে পারে না নিশ্চয়ই। 'বিবিধ প্রবন্ধের' এ সমালোচনা লেখার বহু আগেই বঙ্কিমচন্দ্র উপন্যাস রচনায় হাত দিয়েছিলেন। এবং একটি বিশেষ আদর্শ ও উদ্দেশ্য নিয়েই যে তিনি সাহিত্যজীবনের ভূমিকারম্ভ করেছিলেন তাতে সন্দেহ নেই। নিছক চিত্তরঞ্জনী বৃত্তি যে উৎকৃষ্ট সাহিত্যের লক্ষণ হতে পারে না—এ উপলব্ধি সাহিত্যিক বঙ্কিমচন্দ্রের প্রথমতম উপলব্ধি বলা চলে। তবু একথা দ্বিধাহীনভাবেই স্বীকার করা হয়ে থাকে যে, বঙ্কিমচন্দ্রের সব বক্তব্য সব উদ্দেশ্যই শেষ পর্যন্ত একটি বক্তব্যে পরিণত হয়েছে। সেযুগের অন্যান্য সাহিত্যিকের রচনায় যে সাধারণ সত্যটি বড়ো হয়ে ধরা পড়েছিল, কাব্যে-নাটকে-প্রবন্ধে যে বক্তব্যটি আমাদের অন্তর স্পর্শ করেছিল,—সেই স্বদেশপ্রেমের বাণী বঙ্কিমচন্দ্রের সব রচনার সারভূত সত্যরূপে প্রমাণিত হয়েছে। উপন্যাস-প্রবন্ধ-সমালোচনা এই তিনটি ক্ষেত্রেই সাহিত্যিক বঙ্কিমচন্দ্র স্বকীয়শক্তির বিশিষ্ট পরিচয় রেখে গেছেন, এই তিনটি বিভাগেই যে কথাটি সব বক্তব্য ছাপিয়ে উঠেছে,—তা হল স্বদেশপ্রেমী বঙ্কিমচন্দ্রের দেশপ্রেমের-দেশোপলব্ধির নিগূঢ় কথা। আপাততঃ উপন্যাস প্রসঙ্গেই আমাদের আলোচনা সীমিত থাকবে, ক্রমশঃ দেশপ্রেমিকতাই বঙ্কিমচন্দ্রের

সব সৃজনের মূলে সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী প্রেরণা বলে প্রমাণ করা আমাদের পক্ষে কিছুমাত্র কষ্টকর হবে না। Encyclopaedia Britannica-তে বঙ্কিমচন্দ্র প্রসঙ্গে বলা হয়েছে,

To his contemporaries his voice was that of a prophet; his valiant hindu heroes aroused their patriotism and pride of race··· In him nationalism and Hinduism merged as one.[৯]

সাহিত্য সম্রাট বলে যে অভিধায় বঙ্কিমচন্দ্রকে ভূষিত করেছি সেটি তাঁর পূর্ণ পরিচয় বহন করে না,—সত্যিই তিনি সাহিত্য জগতের সম্রাট কিন্তু এই অপ্রতিদ্বন্দ্বী সম্রাটের অন্তরটি সমগ্র দেশের জন্য, জাতির জন্য সর্বদাই অমেয় প্রেম ও ভালোবাসা বহন করেছে,—সেই গভীর দেশাত্মবোধের কিছু ইঙ্গিত তাঁর বিশেষণে থাকা দরকার। এ প্রসঙ্গে হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর মূল্যবান উক্তিটি স্মরণ করি।

বঙ্কিমবাবু যাহা কিছু করিয়াছেন···সব গিয়া একপথে দাঁড়াইয়াছে। সে পথ জন্মভূমির উপাসনা—জন্মভূমিকে মা বলা—জন্মভূমিকে ভালবাসা—জন্মভূমিকে ভক্তি করা। তিনি এই যে কার্য করিয়াছেন, ইহা ভারতবর্ষের আর কেহ করে নাই।[১০]

স্বদেশপ্রেমের আবেগ যে লেখকের প্রেরণা, উপন্যাসের মত নিতান্ত তন্ময় সাহিত্যেও (Objective Literature) তার প্রতিফলন পড়া কিছুমাত্র অস্বাভাবিক নয়। বঙ্কিমচন্দ্রের স্বদেশপ্রেমের গভীর পরিচয় তাঁব প্রথম উপন্যাসটিতেই বর্তমান। যদিও 'মৃণালিনী' থেকেই দেশপ্রেমোচ্ছ্বাসের প্রথমারম্ভ বলে ধরে নেওয়া হয়। 'দুর্গেশনন্দিনীর' রচনাকালে গদ্যসাহিত্যের শৈশব অতিক্রান্ত হয়েছে,—নাটক রচনা একটা সাধারণ ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে,—অসংখ্য পত্র পত্রিকা রসিক-বাঙ্গালীর রসতৃষ্ণা মিটিয়েছে,—সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য সংবাদ এই যে, বাঙ্গালী মধুসূদনের প্রতিভাকে আবিষ্কার করেছে, প্রতিষ্ঠা দিয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের দ্বারোদ্ঘাটন হয়েছে,—ইংরাজী শিক্ষাদীক্ষার প্রত্যক্ষ সুফল ও পরোক্ষ প্রভাব কি হতে পারে—তা নিয়ে যুক্তিপূর্ণ আলোচনাপর্ব সমাপ্ত হয়েছে। বঙ্কিমচন্দ্রের সুবিধে ছিল এই যে, তাঁকে মধুসূদনের মত একটি অপ্রস্তুত পটভূমিকায় এসে দাঁড়াতে হয়নি। মধুসূদনের আবির্ভাবকে তাই যতটা আকস্মিক, যতটা অচিন্ত্যনীয় বলে মনে হয় বঙ্কিমচন্দ্রকে যুগের পটভূমিকায় ততটা আকস্মিক বলে মনে হয় না। মধুসূদনের সামনে ছিল অজস্র প্রলোভন কিন্তু তার ফলাফলের দৃষ্টান্ত হাতের কাছে ছিল না,—কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্র

৯. Encyclopaehia Britannica, (VOI-5), England, 1962,

১০. বঙ্কিমচন্দ্র জীবন ও সাহিত্য, প্রেমেন্দ্র মিত্র লিখিত গ্রন্থ থেকে উদ্ধৃত।

ইয়ংবেঙ্গলের ইতিহাস পাঠ করার সুযোগ পেয়েছিলেন। সুতরাং দিশাহারা হবার মত পরিবেশ, চঞ্চল হবার মত জটিল আবহাওয়া ছিল না বলেই প্রথমাবধি বঙ্কিমচন্দ্র যুক্তিবাদী-চিন্তাশীল-আদর্শবাদী। উচ্চশিক্ষা তাঁর মনের বিচার শক্তি বাড়িয়েছে, তাঁকে বিভ্রান্ত করেনি। স্থিতধী বঙ্কিমচন্দ্র তাই অনেক ভেবেচিন্তে ইংরাজী উপন্যাস রচনা করার প্রয়াস খুব সহজেই বর্জন করতে পেরেছিলেন,—দ্বিধাগ্রস্ত হননি বিন্দুমাত্র।

১৮৬৫ খ্রীষ্টাব্দের মার্চ মাসে দুর্গেশনন্দিনী প্রথম প্রকাশিত হলেও এই অনতিদীর্ঘ উপন্যাসটি শুরু হয়েছিলো তারও তিন বছর আগে।

লেখকের সংশয় ছিল যে যথার্থ উপন্যাস হিসেবে এটি গৃহীত হবে কিনা। কিন্তু দ্বিতীয় উপন্যাসটি এক বছর পরেই প্রকাশিত হয়েছিল, বঙ্কিমচন্দ্র তখন আত্মবিশ্বাসে, শক্তিসচেতনতায় দৃঢ়।

প্রথম উপন্যাসে ঔপন্যাসিক নূতন সৃজনের আবেগে কম্পিত হলেও স্বদেশপ্রেমিক বঙ্কিমচন্দ্র বিষয়বস্তু ও কাহিনী নির্বাচনে, চরিত্ররচনায়, পরিস্থিতি অঙ্কনে যে মৌলিকত্ব দেখিয়েছেন তার প্রেরণা দেশপ্রেমের অনুভব থেকেই। এই গভীর দেশাত্মবোধের স্পর্শ ছিল বলেই হয়ত দুর্গেশনন্দিনীর আত্মপ্রকাশ বাংলাদেশে একটি স্মরণীয় ঘটনা বলে চিহ্নিত হয়েছিল। বাংলার ঘরে ঘরে এই গ্রন্থ কী সমাদরে গৃহীত হয়েছিল তার অজস্র প্রমাণ আমরা পাই। শিবনাথ শাস্ত্রী তাঁর 'রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ' গ্রন্থে লিখেছেন,—

"আমরা সেদিনের কথা ভুলিব না। 'দুর্গেশনন্দিনী' বঙ্গসমাজে পদার্পণ করিবা-মাত্র সকলের দৃষ্টিকে আকর্ষণ করিল। এ জাতীয় উপন্যাস বাঙ্গালাতে কেহ অগ্রে দেখে নাই।...দেখিয়া সকলে চমকিয়া উঠিল। কি বর্ণনার রীতি, কি ভাষার নবীনতা, সকল বিষয়ে বোধ হইল, যেন বঙ্কিমবাবু দেশের লোকের রুচি ও প্রবৃত্তির স্রোত পরিবর্তিত করিবার জন্য প্রতিজ্ঞারূঢ় হইয়া লেখনী ধারণ করিয়াছেন।"[১১]

'দুর্গেশনন্দিনীর' মধ্যে বঙ্কিমচন্দ্রের উদ্দেশ্য ও আদর্শের প্রসঙ্গটি শিবনাথ শাস্ত্রী উল্লেখ করেছেন। "দেশের লোকের রুচি ও প্রবৃত্তির স্রোত পরিবর্তনের" চেষ্টাটি তিনি লক্ষ্য করেছিলেন। একদিকে নতুন উপন্যাস রচনার উন্মাদনা অন্যদিকে একটি নিশ্চিত আদর্শে জাতিকে দীক্ষিত করার মহান ব্রত গ্রহণ করেই বাংলা উপন্যাসের ক্ষেত্রে তাঁর আবির্ভাব। "দুর্গেশনন্দিনী"তেই বঙ্কিমচন্দ্রের প্রবণতা ধরা পড়েছিল স্পষ্টভাবে। 'দুর্গেশনন্দিনী'র প্রসঙ্গে বিপিনচন্দ্র পাল বলেছিলেন,—

১১. শিবনাথ শাস্ত্রী, রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ, ১৩৬২।

"দুর্গেশনন্দিনী আমাদের স্বদেশাভিমানকে জাগিয়ে দিল। আমাদের অন্তরের সমস্ত সহানুভূতি আমরা উজাড় করে দিলাম বীরেন্দ্রসিংহের উদ্দেশে।"[১২] সুতরাং নিছক উপন্যাস হিসেবে বঙ্কিমচন্দ্র যা লিখতে চাননি পাঠকও তা নিছক উপন্যাস হিসেবে নেয়নি। স্বদেশপ্রেমিক বঙ্কিমচন্দ্রের দেশপ্রীতির পরিচয় এ উপন্যাসে কিভাবে প্রতিফলিত সে আলোচনারও আগে বঙ্কিমচন্দ্রের স্বদেশভাবনার কিছু পরিচয় দেওয়া দরকার।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম স্নাতক বঙ্কিমচন্দ্র প্রখর আত্মসচেতনতা নিয়ে লক্ষ্য করেছিলেন—সেযুগের শিক্ষিতাভিমানী বাঙ্গালীর সত্যকার মানসিক চিন্তাধারার বিবর্তন। ইংরেজী শিক্ষাদীক্ষা পুরোমাত্রায় গ্রহণ করে যে শিক্ষিত সমাজ গোত্রান্তরিত-ধর্মান্তরিত-রূপান্তরিত হয়েছিলেন তাঁদের দৃষ্টান্ত বঙ্কিমচন্দ্রের মনে একটা প্রচণ্ড আবেদন জাগিয়েছিল।—সে যুগীয় ধর্মান্দোলন আর সংস্কৃতির আন্দোলনের কিছু পরেই বঙ্কিমচন্দ্রের আগমন। প্রখর বিচারশক্তি ও মৌলিক চিন্তার ক্ষমতা ছিল বলেই বঙ্কিমচন্দ্র নিজের ভাবীজীবন তাঁর স্বকীয় আদর্শেই গড়েছিলেন। শুধু ইংরেজীশিক্ষার পাঠগ্রহণে সন্তুষ্ট না হয়ে রীতিমত সিলেবাস মিলিয়ে পাঠ সমাপনান্তে ডিগ্রী ধারণ করেছিলেন যিনি, তিনি শিক্ষা গ্রহণের ব্যাপারেও যে বেশ একটা নিজস্ব আদর্শ মেনে চলেছিলেন সেটুকুই প্রমাণিত হয়। শিক্ষাজীবন সমাপ্ত হলে অন্যান্য উচ্চশিক্ষিত বাঙ্গালীর মতো বঙ্কিমচন্দ্র সরকারী চাকুরী ও উচ্চাকাঙ্ক্ষী বাঙ্গালীর মতো সাহিত্যসাধনা একই সঙ্গে সমান গুরুত্ব দিয়ে গ্রহণ করেছিলেন। প্রয়োজনের তাড়নায় চাকরী আর আত্মিক প্রয়োজনের তাগিদে কলম ধরতে হয়েছিল বলেই বঙ্কিমচন্দ্র উভয়ক্ষেত্রেই কৃতী, উভয়ক্ষেত্রেই পারদর্শিতার ছাপ রেখেছেন।

বঙ্কিমচন্দ্রের সাহিত্য জীবনের আদর্শ প্রসঙ্গে একটি তথ্য প্রায় সকলেই মেনে নিয়েছেন। কৈশোর থেকেই বঙ্কিমচন্দ্র স্বদেশপ্রেমিক কবি ঈশ্বরগুপ্তের সান্নিধ্যে আসার সুযোগ পেয়েছিলেন বলেই সাহিত্যজীবনের গুরু হিসেবে ঈশ্বরগুপ্তকেই গ্রহণ করেছিলেন। কোনো সমালোচক বলছেন,—

"সংবাদপ্রভাকর ছাড়া কলকাতার বিদ্বৎসমাজের সঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্রের আর কোনো যোগসূত্র ছিল কিনা সন্দেহ।"[১৩]

পরবর্তীকালে ঈশ্বরগুপ্তের দেশপ্রীতির উচ্ছ্বসিত গুণগান করে বঙ্কিমচন্দ্র গুরুর জয়-ঘোষণা করেছিলেন। বাংলা সাহিত্যের সাধারণ স্তরের লেখককেও একটা অসাধারণ

১২. বিপিনচন্দ্র পাল, চরিত চিত্র, ১৯৫৮, পৃঃ—১৫৯।

১৩। ভবতোষ দত্ত, চিন্তানায়ক বঙ্কিমচন্দ্র, ১৯৬১, পৃষ্ঠা ৩।

দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করে বঙ্কিমচন্দ্র সাহিত্যে তাঁকে স্থায়ী সম্মান জানানোর দাবী তুলেছিলেন। কিন্তু ঈশ্বরগুপ্তের দেশচর্চা বঙ্কিমকে যে যথার্থভাবেই আকৃষ্ট করেছিল—এ তথ্যটি নিঃসন্দেহে গৃহীত হবে। ঈশ্বরগুপ্তের দেশপ্রীতির প্রত্যক্ষ আবেদন চিন্তাশীল বঙ্কিমচন্দ্রকে প্রভাবিত করলেও 'সংবাদ প্রভাকরে' প্রকাশিত বঙ্কিমচন্দ্রের বাল্যরচনায় দেশপ্রেমের বাষ্পটুকুও নেই। অবশ্য বাল্যরচনা দিয়ে পরবর্তী কালের সাহিত্যিককে বিচার করতে গেলে যে ভ্রমে পতিত হতে হয়, তা ত আমরা জানি। ঈশ্বরগুপ্তের সাক্ষাৎ শিষ্য হিসেবে দীনবন্ধু ও বঙ্কিমকে গ্রহণ করেছি আমরা কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্র যে সুগভীর দেশচিন্তার পরিচয় দিয়েছেন সেখানে ইংরেজী-শিক্ষিত বঙ্কিমচন্দ্রের মৌলিক চিন্তার প্রাধান্যই বেশী,—তা সম্পূর্ণই ঈশ্বরগুপ্ত প্রভাবিত দেশচিন্তা বললে ঠিক বলা হয় না।

বঙ্কিমচন্দ্রের চিন্তাধারার ধারাবাহিক ইতিহাস ও ক্রমপরিণতির স্তর বিশ্লেষণ করলে স্বদেশচিন্তার প্রকৃত রূপটি জানা যাবে কিন্তু মূল উপাদানগুলি অনুসন্ধানের জন্য আমাদের খুব বেশী পরিশ্রম করতে হয় না। নবজাগরণলগ্নে যে বোধ শিক্ষিত ও সচেতন বাঙ্গালীকে পীড়িত করেছে,—পরাধীনতার সেই দুঃসহ বেদনা অন্যান্য কবি-সাহিত্যিকদের মতো বঙ্কিমচন্দ্রকেও পীড়িত করেছিলো। সমসাময়িক ঘটনার আঘাতে এই মনোকষ্ট দিন দিন বেড়েই গেছে। স্বদেশচেতনার অনুভূতির কোন পৃথক চেহারা নেই বলে নিতান্ত ব্যক্তিগত শোকদুঃখের মতো তা হয়ত সর্বদা বিশিষ্টতা অর্জন করতে পারে না—কিন্তু স্বদেশপ্রেমিকের অনুভূতিগুলি অন্যান্য অনুষঙ্গ পেলেই উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠে সহজেই। মধুসূদনের তীব্রতম দেশচেতনা রাবণের খেদোক্তিতে কত সহজেই উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠেছিল। বঙ্কিমচন্দ্রের দেশপ্রীতির মূলে রয়েছে অতীত ইতিহাসপ্রীতি। একটি জাতির নিতান্তই বর্তমান দেশোন্মাদনায় তুষ্ট ছিলেন না বঙ্কিমচন্দ্র। এই উচ্ছ্বাস হঠাৎ আসা বেনোজলের মত সমগ্র দেশ প্লাবিত করবে বটে কিন্তু তা স্থায়ী হবে না। দেশপ্রেম শুধু শিক্ষাভিমানী বাঙ্গালীর চিন্তাজগতে একচেটিয়া হয়ে থাকুক—বঙ্কিমচন্দ্র তা চাননি। তাই উদ্দেশ্যের দৃঢ়তা নিয়ে বাঙ্গালীর মনে স্থায়ী চেতনা জাগানোর শুভ সংকল্প নিয়ে তাঁর প্রথম উপন্যাস রচনার চেষ্টা।

প্রখর অনুভূতি, দেশ ও জাতির জন্য অকুণ্ঠ মমতায় বিগলিতচিত্ত বঙ্কিমচন্দ্র প্রথম উপন্যাসেই দেশকে সচেতন করে তোলার চেষ্টা করেছেন। 'দুর্গেশনন্দিনী' বাংলাদেশের অতীতের কাহিনী। এ কাহিনীর নায়ক হিন্দুর শক্তি ও সামর্থ্যের প্রতীক। ইতিহাসের চুম্বকে দেশপ্রেমিক যখন কাহিনীরচনা করতে চান তাতে ঐতিহাসিকত্ব পুরাপুরি পাওয়া যায় না, কিন্তু কথা-সাহিত্যিকের ইতিহাসমুগ্ধতার প্রমাণ মেলে। তাই ইতিহাস নয়,—অতীত বাংলার একটি বীরত্ব কাহিনী

পরিবেশনের সাহিত্যিক প্রচেষ্টাই 'দুর্গেশনন্দিনী'তে বড়ো হয়ে ধরা পড়েছে। রোম্যান্টিক পরিবেশে গল্প কথনের প্রথমশ্রেণীর দক্ষতার পরিচয় 'দুর্গেশনন্দিনীতে' রয়েছে,—সে প্রতিভা ভাবী ঔপন্যাসিকের উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ জীবনের দিকে ইঙ্গিত দেয়। কিন্তু বিষয়বস্তুর সঙ্গে বাঙ্গালীজীবনের এমন একটি নিবিড় যোগাযোগ স্থাপন করেছেন বঙ্কিমচন্দ্র যা আমাদের কাছে নিছক গল্পপাঠের অতিরিক্ত একটি চিন্তাসামর্থ্যের যোগান দেয়। সদ্যোজাগ্রত পরাধীনতার চেতনায় আমাদের অতীত ইতিহাসের ওপর আলোকপাতের চেষ্টাটি তাই অত্যন্ত অর্থপূর্ণ মনে হয়। রঙ্গলালের রাজপুত ইতিবৃত্তপাঠ করেও আমরা এ জাতীয় আনন্দ পেয়েছিলাম। কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্র সে আনন্দের পেছনে কিছুটা চিন্তাশক্তিও জাগিয়ে দিলেন। সুদূর রাজস্থানে যেতে হল না—কিংবা মারাঠা ইতিহাসের মধ্যে আত্মবিম্ব দর্শনের চেষ্টা করতে হল না,—বাঙ্গলার অতীত কাহিনীতেই যথেষ্ট রোম্যান্স ও বীররসের সন্ধান পাওয়া গেলো।

ভূদেব তাঁর অনুবাদ কাহিনীতে মারাঠাবীর শিবাজীর স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রসঙ্গটি বর্ণনা করেছিলেন—কিন্তু বঙ্কিম ঘরোয়া কাহিনী দিয়েই আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করলেন। বাঙ্গালী জীবনভিত্তিক এ জাতীয় কাহিনীতে বীররসের দ্বারা দেশপ্রেম সঞ্চারের চেষ্টা এই প্রথম। অবশ্য বাংলাদেশের রাজনৈতিক ইতিহাস অবলম্বন করলেও রাজপুতবীর জগৎসিংহকেই এ কাহিনীর কেন্দ্রীয় চরিত্র রূপে কল্পনা করেছেন লেখক। কিন্তু ঘটনাস্থল বাংলাদেশ বলেই বীরেন্দ্রসিংহ চরিত্রটিও যথেষ্ট দূরদর্শিতার সঙ্গে ফুটিয়ে তুলেছেন। সহায়সম্বলহীন এই বাঙ্গালী যুবা স্বীয় বুদ্ধিবলে প্রতিষ্ঠা, খ্যাতি ও আত্মসম্মানবোধ অর্জন করেছিল। মূল কাহিনীর নেপথ্যে বিচরণ করলেও বঙ্কিমচন্দ্র বীরেন্দ্রসিংহের দৃপ্ত তেজ ও মানসিক দৃঢ়তার প্রসঙ্গ বর্ণনা করেছেন। মোঘল পাঠানযুদ্ধ ঘনিয়ে এলে বীরেন্দ্রসিংহ দুপক্ষকেই শত্রু বলে মনে করছে। স্বাধীনতাকাঙ্ক্ষী ভূস্বামী বীরেন্দ্রসিংহের মনে ছিল আত্মপ্রতিষ্ঠার গোপন ইচ্ছা। কিন্তু শক্তিহীনতা হেতু সে আকাঙ্ক্ষা কখনও বাস্তবায়িত হতে পারেনি। তাই অভিরাম স্বামী বারেন্দ্রসিংহকে পরামর্শ দিয়েছেন,—

তুমি নিজে বীরাগ্রগণ্য, কিন্তু তোমার সেনা সহস্রাধিক নহে; কোন যোদ্ধা সহস্রেক সেনা লইয়া শতগুণ সেনা বিমুখ করিতে পারে? মোঘল পাঠান উভয় পক্ষই সেনাবলে তোমার অপেক্ষা শতগুণ বলবান, একপক্ষের সাহায্য ব্যতীত অপর পক্ষের হস্ত হইতে উদ্ধার পাইতে পারিবে না।

[বঙ্কিম রচনাবলী, দুর্গেশনন্দিনী, সাঃ সংসদ সংস্করণ]

বাংলা দেশের সেই সংকটকালে বাঙ্গালীর বাহুতে বল ও মনে সাহস ছিল কিন্তু প্রবলতর শত্রুদমনের অন্য কোন উপায় ছিল না। বীরেন্দ্রসিংহ শেষ পর্য্যন্ত

আত্মরক্ষা করলেন মোঘল পক্ষে যোগদান করে। কিন্তু পাঠানের বিপক্ষতা করায় বীরেন্দ্রসিংহকে চরম শাস্তি পেতে হল। এ অংশটি উপন্যাসের প্রয়োজনে রচিত হয়েছে বটে কিন্তু বীরেন্দ্রসিংহের মর্মান্তিক মৃত্যুর ঘটনাটি আমাদের মনে একটা স্থায়ীভাব জাগিয়ে দেয়। শক্তিহীনতার অভিশাপ এমনি করেই দুর্বলের মৃত্যুদণ্ড বহন করে আনে। কিন্তু মৃত্যুমুহূর্তেও বীরেন্দ্রসিংহের দৃঢ়তার চিত্রটি তুলনাহীন। শত্রুদত্ত অনুকম্পাকে ঘৃণা করেছে বীরেন্দ্রসিংহ,—

"তুমি রাজবিদ্রোহী দস্যু, তোমাকে কেন অর্থ দিব? তোমায় কি জন্য সৈন্য দিব?···তোমার তুল্য শত্রুর দয়ায় যার জীবনরক্ষা,—তাহার জীবনে প্রয়োজন?"

বীরেন্দ্রসিংহকে স্বাধীনচেতা ভূস্বামী বলে প্রতিষ্ঠিত করার চেষ্টামাত্রও বঙ্কিমচন্দ্র করেন নি। সেযুগের বাংলাদেশে স্বাধীনচেতনার প্রমাণ দেবার মত মানসিক শক্তি যে একেবারে ছিল না তা নয়,—কিন্তু রাজনৈতিক ইতিহাসে স্থান পাবার মত সৈন্যসামন্ত ও যথেষ্ট সামর্থ্য না থাকায় বীরেন্দ্রসিংহের মতই লোকচক্ষুর অগোচরে মৃত্যুবরণ করতে হয়েছিল তাঁদের,—এ সত্যটি 'দুর্গেশ নন্দিনী'তে বঙ্কিমচন্দ্র প্রকাশ্য ভাবে ঘোষণা করেছেন বলা যায়। বাঙ্গালীর ইতিহাস যে নেই তার কারণ বীরেন্দ্র-সিংহের মত শক্তিহীন ভূস্বামীদের কথা রাষ্ট্রনীতিবিদের নজরে পড়ে না। বঙ্কিমচন্দ্র এ কাহিনীতে যে চেতনা সঞ্চার করেছেন,—তা যে খুব সূক্ষ্ম জাতীয় চেতনারই রূপান্তর এ কথা অস্বীকার করা যায় না। বীরেন্দ্রসিংহের নিঃশব্দ মৃত্যুচিত্রটির এ ছাড়া অন্য ব্যাখ্যা কি দেওয়া যায়? বীরেন্দ্রসিংহ আত্মরক্ষার মুহূর্তে দ্বিধাগ্রস্ত হয়েছিলেন,—পাঠান বা মোঘল এই উভয় শত্রুর মধ্যে কোনটিকে গ্রহণ করা যায়? বঙ্কিমচন্দ্রও সে দ্বিধার ভাব কাটিয়ে উঠতে পারেননি। 'দুর্গেশনন্দিনী'তেই হিন্দু চরিত্রের সমালোচনা করে পাঠানপ্রশংসা করেছেন তিনি। ওসমান ও জগৎসিংহ—বঙ্কিমচন্দ্র এ'দুটি চরিত্রেই অসংখ্য লক্ষ্যণীয় গুণের সমাবেশ ঘটিয়েছেন। কখনও কখনও ওসমানের বীরোচিত গুণ অনেক বেশী বলে মনে হয়। তাছাড়া নিষ্ঠাবান পাঠানচরিত্র হিসেবে ওসমান অতুলনীয়—সেদিক থেকে মোঘল সেনাপতি হিসেবে হিন্দু হলেও জগৎসিংহ কিছুটা প্রভাহীন। ওসমানের শিষ্টাচার—রাজানুগত্য এবং হৃদয়াবেগের শান্ত-নিস্তরঙ্গ রূপ যে কোন মনকেই মুগ্ধ করে। শত্রুকে আতিথ্যপ্রদান করেও উত্তেজিত শত্রুর সামনে যে ভদ্রতা ও চারিত্রিক দৃঢ়তার পরিচয় দিয়েছেন ওসমান, তাতেই বঙ্কিমচন্দ্রের পাঠানপ্রীতির পরিচয় দীপ্যমান। জগৎসিংহকে মোঘলসম্রাটের উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করার উত্তরে ওসমান বলেছেন,—

আত্মগরিমা আমার উদ্দেশ্য নহে। মোঘল সম্রাটের সহিত চিরদিন বিবাদ করিয়া পাঠানের উৎকলে তিষ্ঠান সুখের হইবে না। কিন্তু মোঘল সম্রাট পাঠানদিগকে

কদাচ নিজ করতলস্থ করিতে পারিবেন না। আমার কথা আত্মশ্লাঘা বিবেচনা করিবেন না। পাঠানেরা বাঙ্গালী নহে, কখনও অধীনতা স্বীকার করে না; একজন মাত্র জীবিত থাকিতে কখনও করিবেও না; ইহা নিশ্চিত কহিলাম।

এ উপন্যাসে স্বদেশপ্রেমের কোন বিস্তৃত পটভূমিকা অঙ্কন করার চেষ্টা করেননি লেখক, কিন্তু জাতীয়চেতনা বঙ্কিমচন্দ্রের আত্মচেতনার গভীরে কিভাবে স্থান লাভে সমর্থ হয়েছিল সে সত্য এ উপন্যাস পাঠ করে সহজেই বোঝা যায়। রোম্যাণ্টিকতা ও উপন্যাসোচিত ঘটনাসমাবেশ সমগ্র 'দুর্গেশনন্দিনী'তেই আছে—সমালোচনার সূক্ষ্ম বিচারে তা ধরা পড়েছে, কিন্তু স্বদেশপ্রাণতা উপন্যাস বিচারের অন্যতম উপাদান হতে পারেনি কোনদিন, সমালোচকবর্গ তাই এ ব্যাপারে নীরব। স্থান-কাল-পাত্র এ তিনের নিখুঁত বিচারে ঔপন্যাসিকের ব্যর্থতা ও সার্থকতার মাপজোখ করার প্রসঙ্গ বাদ দিয়ে আমরা তাঁর উদ্দেশ্য ও উদ্দেশ্যের প্রতিফলন উপন্যাসে কিভাবে দেখা গেছে সে বিষয়ে আলোচনা করব।

উদ্দেশ্যহীন রচনামাত্রই বঙ্কিমের বিচারে প্রাণহীন সৃজন, 'দুর্গেশনন্দিনী'তে স্বদেশচেতনাই উপন্যাসের প্রাণ বলা যেতে পারে। উদ্ধৃত উক্তিটির শেষাংশ আলোচনা করলে দেখব যে, নিছক ওসমানের বীরত্ব ও চারিত্রিক দৃঢ়তা ফোটানোর জন্যই অংশটি রচনা করেননি লেখক—বাঙ্গালীর চরিত্র সমালোচনা করে পরাধীন বাঙ্গালীর সামনে স্বাধীনতাপ্রিয় পাঠানের জীবনাদর্শ পাশাপাশি দেখাবার চেষ্টাও করেছেন। এটি উদ্দেশ্যমূলক অংশ হিসেবে বিচার্য।

'দুর্গেশনন্দিনী' রচনায় পাশ্চাত্য আদর্শের প্রভাব পড়েছিল বলে অনুমান করা হয়। বিদেশী সাহিত্যের প্রভাবে যদি বিমলার সৃষ্টি হয়ে থাকে তবে তাতে আমাদের উপকারই হয়েছে বলতে হবে। ব্যক্তিত্ব, আত্মমর্যাদা, দৃঢ়তা ও অসমসাহসিকতা এদেশীয় পুরুষচরিত্রেই অকল্পনীয়,—বঙ্কিমচন্দ্র একটি নারী চরিত্রেই তা আরোপ করেছেন। কিন্তু বীরেন্দ্রসিংহ ও অভিরাম স্বামী, জগৎসিংহ ও ওসমান এবং দুর্যোগাচ্ছন্ন বাংলাদেশের পটভূমিকায় তিলোত্তমার রোম্যাণ্টিক প্রেমকাহিনীর উন্মেষ ও পরিণতি রচনায় স্বকীয়ত্ব নেই, এ ধারণা ভিত্তিহীন। বঙ্কিমচন্দ্র ঐতিহাসিক পরিবেশের সাহায্য নিয়ে গল্পকথনের চেষ্টা করেছিলেন বলেই বিষয়বস্তুর স্থান কালপাত্রোচিত বর্ণনা দেবার দায়িত্বও তিনি এড়াতে পারেননি। মোঘল-পাঠান বিরোধের পটভূমিকায় পাত্র-পাত্রীদের হৃদয়বেদনার সমস্যাজাল উন্মোচিত করার মধ্যে যথেষ্ট কৃতিত্ব দেখিয়েছেন বঙ্কিমচন্দ্র। লক্ষ্যণীয় এই যে, মোঘল পাঠান প্রতিদ্বন্দ্বী হলেও নায়িকার ভূমিকায় আছেন বঙ্গদেশেরই এক ভূস্বামীর হতভাগিনী কন্যা। এই কারণেই বলেছি, বঙ্কিমের জাতীয়তাবোধ সকলের অলক্ষ্যে থেকেও কতখানি সক্রিয় হয়ে উঠেছে।

ঐতিহাসিক সত্য যাচাইয়ের প্রশ্নটি অবান্তর বলেই বঙ্কিমচন্দ্র বাংলাদেশের একজন ভূস্বামীর অসহায় মৃত্যুবরণের বিবরণটি সবিস্তারে বলার লোভ সম্বরণ করেন নি,—অপ্রাসঙ্গিক হলেও বাঙ্গালিনী বিমলার দুঃসাহসিকতার—প্রতিহিংসার সজীব বর্ণনা দিয়েছেন উপন্যাসে। নিছক রোম্যান্টিক উপন্যাস রচনার সুযোগটুকু গ্রহণ না করে—বাংলাদেশের রাজনৈতিক জটিলতার আবর্তসৃজন করে 'দুর্গেশনন্দিনী' তিলোত্তমার সুকোমল হৃদয়াবেগের অপরূপচিত্র সৃষ্টি করেছেন বঙ্কিমচন্দ্র। শুধু উপন্যাস লিখেই আমাদের প্রশংসা লাভ করা তাঁর পক্ষে সম্ভব ছিল অথচ তিনি তাঁর বিশুদ্ধ স্বদেশচিন্তার অভিমানটুকু পূর্ণমাত্রায় কাজে লাগিয়েছিলেন—এখানেই স্বদেশপ্রাণ বঙ্কিমচন্দ্রের বৈশিষ্ট্য। উপন্যাসের আধারে এই নবলব্ধ জাতীয়তাবোধের অনুভূতিটুকু সূক্ষ্মভাবে পরিবেশন করলে তাতে রসসৃষ্টির ব্যাঘাত হয় না,—আত্মদর্শনেরও সুযোগ মেলে।

প্রথম উপন্যাসেই আদর্শবাদী বঙ্কিমচন্দ্র সাহিত্যসৃষ্টির উদ্দেশ্য মেনে চলেছেন। নিছক চিত্তরঞ্জনী বৃত্তি নয়,—চিৎশক্তি উদ্‌ঘাটনের সহায়ক হিসেবেই উপন্যাসের পরিকল্পনা করেছেন। পরবর্তী উপন্যাসগুলিতে তাঁর এই প্রবণতা তুঙ্গশীর্ষে আরোহন করেছে বলা যায়। কয়েকটি ধাপ পেরিয়ে শেষ তিনটি উপন্যাসে বঙ্কিমচন্দ্র ধর্মতত্ত্ব—অনুশীলনতত্ত্ব—ভারতীয় শাস্ত্র গ্রন্থের মূলতত্ত্ব উপন্যাসাকারে পরিবেশনের বিপুল আয়োজন করেছিলেন। প্রথম দিকে বঙ্কিমচন্দ্র উপন্যাসে যে বক্তব্য পরিবেশন করেছেন তা সে যুগের বাঙ্গালীর কাছে মোটামুটি অনুধাবনীয় তত্ত্বকথা। 'দুর্গেশনন্দিনীর' রোম্যানস নিবিড়তার মাঝখানে জগৎসিংহ—বীরেন্দ্রসিংহের বীরত্বকথার অন্তরালে বঙ্কিমচন্দ্রের বক্তব্য অত্যন্ত স্বচ্ছ। মৃণালিনীতেও অনুরূপ চেতনা নিয়েই বঙ্কিমচন্দ্র বাঙ্গালীর চিন্তাশক্তি জাগানোর চেষ্টা করেছিলেন। প্রথম উপন্যাসে ঐতিহাসিক পটভূমিকার প্রয়োজন ছিল গল্পরস ঘনীভূত করার জন্য, দ্বিতীয় উপন্যাসে একটি বিশেষ দায়িত্ব পালনের সংকল্প নিয়েই বঙ্কিমচন্দ্র ইতিহাস প্রসঙ্গের অবতারণা করেছিলেন।

'মৃণালিনী' উপন্যাস সম্পর্কে মোটামুটিভাবে সব সমালোচকের বক্তব্য যেখানে এক—তা হচ্ছে, এ উপন্যাসে দেশাত্মবোধের বিকাশ সম্পর্কিত মন্তব্য। বাঙ্গালার ইতিহাস ও বাঙ্গালীর ইতিহাস সম্পর্কে কৌতূহলী বঙ্কিমচন্দ্র বিদেশীরচিত ইতিহাস পড়ে শুধু দুঃখিত নয়,—বিরক্ত ও বিক্ষুব্ধ হয়েছিলেন। মৃণালিনী রচনার উৎস বঙ্কিমচন্দ্রের বিক্ষুব্ধ অন্তর, দেশের কলঙ্ককথা মোচনের আপ্রাণ চেষ্টায় মগ্ন বঙ্কিমচন্দ্রের এই দেশসাধনাকেই আমরা বিশুদ্ধ স্বদেশপ্রাণতা বলে ব্যাখ্যা করব। 'মৃণালিনী' স্বদেশপ্রাণ বঙ্কিমচন্দ্রের গভীর দেশাত্মবোধের স্মারকগ্রন্থ। বাঙ্গালীর আত্মজাগরণ লগ্নে দেশপ্রীতির স্বতোৎসার লক্ষ্য করেছি আমরা, বঙ্কিমচন্দ্র বুঝেছিলেন এই অনুভূতি যদি শুধুমাত্র ক্ষণিক ও বায়বীয় উচ্ছ্বাসেরই নামান্তর হয়ে ওঠে,—তবে তা থেকে

জাতি কিছুই লাভ করবে না। তাই দেশের মাটিতেই দেশাত্মবোধের বীজ বপন করতে হবে,—দেশের অতীত ইতিহাসের সঙ্গে, বিগত ঐতিহ্যের সঙ্গে, দেশাত্মবোধের সংযোগ ঘটাতে হবে। বঙ্কিমচন্দ্র নবলব্ধ জাতীয়তাবোধের ভবিষ্যৎ রচনার কাজে মনোনিবেশ করেছিলেন সেকারণে। কাব্যে-নাটকে-সংগীতে, উপন্যাসে দেশপ্রীতিকে নিছক একটি কাল্পনিক আদর্শ হিসেবে ব্যবহার করার সুলভ পদ্ধতি বর্জন করেছিলেন বঙ্কিমচন্দ্র, এখানেই সেযুগীয় স্বাদেশিকতার সঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্রের দেশাদর্শের পার্থক্য। বঙ্কিমচন্দ্র তাই প্রথমাবধি যুক্তিধর্মী,—দেশের ইতিহাস সম্পর্কে অজ্ঞতা ও নীরবতার হেতু নির্ণয়ে দুঃসাহসিক বঙ্কিমচন্দ্র এগিয়ে এসেছিলেন। দেশাত্মবোধের উচ্ছ্বাস থেকে নিছক উত্তেজনা ছাড়া অন্য কিছু মেলে না, বঙ্কিমচন্দ্র সেই অন্তঃসারশূন্য ভাবোচ্ছ্বাসকে একটি বাস্তবভিত্তির ওপরে স্থাপন করতে চাইলেন।

'মৃণালিনী' উপন্যাসে এই আদর্শ রূপায়িত হয়েছে অতীত বাঙ্গালার ইতিহাস আলোচনায়। উপন্যাসের ঘনবদ্ধ ঘটনাজালের আবর্তে দেশাদর্শ ক্ষীণ হয়ে যাবে এই কারণে অনৈতিহাসিক হলেও এমন সব ঘটনা ও চরিত্রের অবতারণা করেছেন যাঁরা বিখ্যাত ঐতিহাসিক চরিত্রের সঙ্গে জড়িত হয়ে আছে। এভাবে উপন্যাসেও বিশ্বাস্য ভূমিকারোপের পরিকল্পনা করেছিলেন তিনি,—সম্ভবতঃ দেশপ্রেমের নির্মল আবেগই এর একমাত্র কারণ।

"মৃণালিনী" উপন্যাসের মূল অবলম্বন স্বদেশপ্রেম,—সেই আলোকেই উপন্যাসটির সমস্ত অবিশ্বাস্য পরিবেশ, চরিত্র, কাহিনী ও ঘটনাজালের মোটামুটি একটা বিচার চলতে পারে। তা যদি সম্ভব না হয়—প্রতিমুহূর্তেই উপন্যাস হিসেবে এর ব্যর্থতা আমাদের পীড়িত করবে সন্দেহ নেই। সুতরাং সৃষ্টি হিসেবে 'মৃণালিনীর' অসার্থকতার আলোচনা থেকে বড়জোড় শিল্পী বঙ্কিমচন্দ্রের অসাবধানতার পরিচয় মিলবে কিন্তু দেশচর্চার উন্মাদ আবেগের রূপটি আবিষ্কার করতে সক্ষম হলে দেশপ্রেমিক বঙ্কিমচন্দ্রের নিষ্ঠার একটি পূর্ণাঙ্গ চিত্র পাব আমরা।

"মৃণালিনী" রচনায় বঙ্কিমচন্দ্র কল্পিত কাহিনী অবলম্বন করেছেন বটে কিন্তু ঐতিহাসিক চরিত্র ও পটভূমিকা দিয়েই কথারম্ভ হয়েছে। হেমচন্দ্র যদিও কল্পিত নায়ক কিন্তু বঙ্গবিজেতা বখ্‌তিয়ার খিলিজি তার প্রতিদ্বন্দ্বী। এই প্রতিদ্বন্দ্বিতার হেতুটিও পুরাপুরি রাজনৈতিক ও ঐতিহাসিক ঘটনাবলম্বনে গড়ে উঠেছে। বাঙ্গালার সত্য ইতিহাসের সন্ধানে ব্যর্থমনোরথ হয়ে বঙ্কিমচন্দ্র বাধ্য হয়েছিলেন কল্পনাশ্রয়ী উপন্যাস রচনায়। কিন্তু বখ্‌তিয়ার খিলিজি যে বঙ্গবিজয় করেছিলেন অনায়াসে,—সেটা মিথ্যা প্রমাণ করা যায় না—এও তিনি জানতেন। মগধ-বিজয় শেষে বঙ্গবিজয়ে অগ্রসর হচ্ছেন বিজয়ী বখতিয়ার খিলিজি, 'মৃণালিনীর'

কাহিনীর শুরুও সেখানেই। ইতিহাস ও উপন্যাস উভয়ই যেখানে প্রাধান্য পেয়েছে—সেখানেও বঙ্কিমচন্দ্র 'মৃণালিনী'কে ঐতিহাসিক উপন্যাস বলায় আপত্তি করেছেন। এর প্রধান হেতু লক্ষ্মণসেন এবং বখ্‌তিয়ার খিলিজি এই দুটি ঐতিহাসিক নাম ছাড়া বঙ্কিমচন্দ্র ইতিহাস থেকে কোন সাহায্য পাননি। বিদেশী ঐতিহাসিকের বিবরণে বঙ্কিমচন্দ্রের শ্রদ্ধা ছিল না। ইতিহাসের সত্যতার ওপর আলোকপাতের প্রাথমিক উদ্দেশ্য বজায় রেখেও মোটামুটি সেযুগের রাজনৈতিক বিপর্যয়ের বিশ্বাস্য-ভূমিকা অঙ্কনে বঙ্কিমচন্দ্র যে ধরণের সাবধানতা অবলম্বন করেছিলেন, তাতে বিস্মিত হতে হয়। বঙ্কিমচন্দ্র এখানেও হিন্দুনেতৃত্ব ও বীরত্বচিত্র অঙ্কনের চেষ্টা করেছেন। বীরেন্দ্রসিংহকে অসহায়ভাবে মৃত্যুবরণ করতে হয়েছিল,—হেমচন্দ্র এখানো কিছুটা সক্রিয়। পিতৃরাজ্য মগধ হারিয়েও হেমচন্দ্র মনোবল হারায়নি, শত্রুদমনের সংকল্প পোষণ করেছেন। 'মৃণালিনীর' আরম্ভে হেমচন্দ্রের পিতৃরাজ্য উদ্ধারের সংকল্প শুনি,

আমি কি চোরের মত বিনাযুদ্ধে শত্রু মারিব? আমি মগধ বিজেতাকে যুদ্ধে জয় করিয়া পিতার রাজ্য উদ্ধার করিব। নহিলে আমার মগধ রাজপুত্র নামে কলঙ্ক।

[১ম পরিচ্ছেদ, ১ম খণ্ড]

এই হিন্দুবীর মহৎ সংকল্প নিয়ে আবির্ভূত হয়েও শেষরক্ষা করতে পারেনি, মৌখিক বীরত্ব ও প্রকৃত বীরত্বের মধ্যে যে পার্থক্য রয়েছে তা এ উপন্যাসে বর্ণিত হয়েছে। শুধু মহৎ ও বৃহৎ উদ্দেশ্য থাকলেই চলবে না,—সেই আদর্শকে রূপদানের জন্য কঠোর সাধনারও প্রয়োজন। সাধনাহীন মহৎ আদর্শ কি ভাবে ব্যর্থ হয়ে যায় 'মৃণালিনী'তে তা দেখেছি আমরা। অবশ্য বাংলার তুর্কী অধিকারকে সত্য ঘটনা বলে ধরে নিতে হয়েছিল বলেই তুর্কীজয়ের সাফল্য দেখাতে বাধ্য হয়েছিলেন তিনি। তবে এই সাফল্যের পশ্চাতে কিছু সাধনাহীন মহৎ আদর্শের ব্যর্থচিত্র ও চরিত্র রচনা করে বঙ্কিমচন্দ্র সান্ত্বনা পেয়েছিলেন কিছুটা। তুর্কী বিজয়ের ঘটনাকে মিথ্যা প্রমাণের কোনো উপায় ছিল না, কিন্তু মিনহাজউদ্দীনের সপ্তদশ অশ্বারোহী কর্তৃক বঙ্গবিজয়ের অবিশ্বাস্য ও ভিত্তিহীন ঘটনাটির প্রতিবাদ করাই বঙ্কিমচন্দ্রের উদ্দেশ্য ছিল। এই উদ্দেশ্য নিয়েই শক্তিহীন বৃদ্ধশাসক লক্ষ্মণসেন, ক্ষমতালোভী নির্বোধ পশুপতি ও প্রেমোন্মত্ত হেমচন্দ্রের অসার্থক প্রচেষ্টার চিত্র অঙ্কন করেছেন বঙ্কিমচন্দ্র। বাঙ্গালীর শক্তির দীনতার চেয়েও যোগ্যনেতৃত্বের অভাবই অনুভব করেছিলেন বঙ্কিমচন্দ্র। অরাজকতাও স্বার্থপরায়ণতার ফলাফলেই বাংলার স্বাধীনতা অস্তমিত হয়েছিলো, এ সত্যটিই বঙ্কিমচন্দ্র বেদনার সঙ্গে উপলব্ধি করেছিলেন। 'মৃণালিনী'তে বঙ্কিমচন্দ্রের আত্মদর্শন ঘটেছিল বলা যায়। সেকারণেই হেমচন্দ্র নায়ক হলেও উদ্‌ভ্রান্ত; যোগ্যতার অভাব না থাকা সত্ত্বেও পশুপতি অযোগ্য বলে প্রমাণিত হয়েছে এ উপন্যাসে। যাই হোক,

স্বদেশাভিমান ছিলো বলেই বঙ্কিমচন্দ্র 'মৃণালিনী' উপন্যাসের পরিকল্পনা করার সাহস সঞ্চয় করেছিলেন। ইতিহাসের সত্যকে পরিবর্তনের চেষ্টা করা যায় না, এ তথ্য কারোরই অজানা নয়। বাঙ্গালীর চারিত্রিক অবনতির যে রন্ধ্রপথে বিদেশী শত্রুর অনুপ্রবেশ, বঙ্কিমচন্দ্র শুধু তার ওপরই আলোকপাতের চেষ্টা করেছিলেন। ঐ সম্পর্কে একটি সমালোচনার প্রসঙ্গ উত্থাপন করা যায়। ১৩১৯ সালে 'রঙ্গপুর দর্পণ' সম্পাদক 'মৃণালিনীর' সমালোচনা প্রসঙ্গে বলেছিলেন,—

"সিংহদ্বারের সম্মুখে দণ্ডায়মান হইয়া যবনসিংহ সিংহনাদ করিতেছে, বৃদ্ধ অকর্মণ্য ভীরু রাজা ভয়ে বিক্ষিপ্ত, রাজ্যরক্ষায় অসমর্থ। এইরূপ সময়ে যদি রাজাকে সরাইয়া সমর্থ পশুপতি স্বয়ং সিংহাসনে আরোহণ করিতেন ও দুর্দান্ত যবনকে যদি উৎসারিত বিতাড়িত ও উৎসাহিত করিতেন, তবে নিন্দার পরিবর্তে তাঁহার প্রশংসা হইত, সমাজ ও দেশ তাঁহার যশোগান করিত, বঙ্গভূমি বক্ষঃস্থল পাতিত করিয়া তাঁহার অক্ষয় কীর্তিস্তম্ভ ধারণ করিত, ইতিহাসের পৃষ্ঠায় সুবৃহৎ সুবর্ণাক্ষরে তাঁহার পবিত্র নাম লিখিত থাকিত।[১৪]

উদ্ধৃত অংশটিতে বঙ্কিমচন্দ্রের প্রতি যে অভিযোগ আনা হয়েছে তাতে সমালোচককে উৎকৃষ্ট পরামর্শদাতা বলা যেতে পারে কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্রের প্রকৃত উদ্দেশ্য অনুধাবন করলে উদ্ধৃত মন্তব্যটিতে বহু অসতর্ক চিন্তা আবিষ্কৃত হবে। বঙ্কিমচন্দ্র 'মৃণালিনী' উপন্যাসে ঐতিহাসিক সত্যকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করার চেষ্টা করেননি বলেই বাস্তব সত্যটিই পরিবেশন করতে হয়েছে তাঁকে। পশুপতিকে আপাততঃ রাজা সাজানো চলত বটে কিন্তু উপন্যাস না হয়ে সেটি নিছক গালগল্পে পর্যবসিত হতো। পশুপতি ও হেমচন্দ্র উভয় চরিত্রেই যে ধরণের দুর্বলতা দেখিয়েছেন, বঙ্কিমচন্দ্রের পরিকল্পনার অভিনবত্ব তাতে বেড়েছে বলেই আমাদের ধারণা। স্বদেশপ্রেমিকতা ও দেশানুভূতি দুটি চরিত্রেই অস্বচ্ছ এবং ব্যক্তিস্বার্থের কাছে সে সব তুচ্ছ হয়ে গেছে বলেই তাঁরা দোষেগুণে সে যুগের প্রতিনিধি স্থানীয় চরিত্র হতে পেরেছেন। নিষ্ঠার আধিক্য থাকলে তুর্কী বিজয় ঐতিহাসিক সত্য হতে পারত না। সোনার বাংলায় বিদেশী অধিকারের সম্ভাবনা সেদিনই বিলুপ্ত হোত। লক্ষ্মণসেনের অকর্মণ্যতার সুযোগ নিয়ে ক্ষমতালাভের এই ষড়যন্ত্রের মধ্যে কিছুটা যুক্তিও আছে, পশুপতিকে নায়ক করে বঙ্কিমচন্দ্র সে কথা বোঝানোর চেষ্টা করেছিলেন। অকর্মণ্য শাসক ও উচ্চাভিলাষী নায়কের শাসকোচিত দৃঢ়তার অভাব থেকে যে ধরণের বিপর্যয় ঘটা সম্ভব, বঙ্কিমচন্দ্র সে কাহিনী উদ্ভাবন করে সমগ্র

১৪. রংপুর দর্পন, কিশোরীমোহন দাস প্রকাশিত, রংপুর, ১৩১৯।

বাঙ্গালী জাতির কলঙ্ক কয়েকটি নির্বাচিত কল্পিত চরিত্রের উপরে আরোপ করেছিলেন। তবে মিন্‌হাজউদ্দীন যে তথ্য পরিবেশন করেছিলেন তার যথার্থ প্রতিবাদ কিংবা যোগ্য প্রতিবাদ হিসেবে 'মৃণালিনী'কে গণ্য করা চলে কি না সেটাই বিচার্য। বঙ্কিমচন্দ্র মানবচরিত্রের অন্তর্দ্বন্দ্ব বিশ্লেষণের মুহূর্তে যে সত্য আবিষ্কার করেছিলেন তাতে দেশপ্রেমিকতার মতো মহৎ আদর্শকেও নিতান্ত ব্যক্তিগত আবেগ উচ্ছ্বাসের কাছে অর্থহীনতায় পর্যবসিত হতে দেখেছেন। তাই হেমচন্দ্র বীর হয়েও অসার্থক, পশুপতি উচ্চাভিলাষী হয়েও ব্যর্থ, সীতারাম স্বাধীনহিন্দু রাজ্য স্থাপনের সহজলভ্য প্রশংসা থেকে বঞ্চিত। উপন্যাসের দাবী ও তথ্যের দাবীকে একত্রিত করার অসুবিধা রয়েছে, বঙ্কিমচন্দ্র শেষপর্যন্ত উপন্যাস-এর দাবী মেনে নিয়েছিলেন। ঐতিহাসিক তথ্যের প্রতিবাদ করেও জীবন সত্যকে বিকৃত করেননি বলেই বঙ্কিমচন্দ্র প্রশংসা পাবেন। তুর্কীরা দেশজয় করেছে সত্য, কিন্তু তা এসেছে ষড়যন্ত্র—বিশ্বাসঘাতকতা, ব্যক্তিগত দুর্বলতা ও ভুলের রন্ধ্রপথে। বাঙ্গালী জাতির সাহসিকতার দৃষ্টান্ত না থাকার প্রশ্নটিই এখানে অবান্তর। পতন সব সময়ই একটি জাতির শক্তি বা দুর্বলতার উপর নির্ভর করে না,—নির্ভর করে সুদক্ষ পরিচালনার ওপরেও। বঙ্কিমচন্দ্র যদি এই সত্যটিও প্রতিষ্ঠা করতে সমর্থ হন তবে তাতেই আমাদের সন্তুষ্ট থাকা উচিত। সম্পূর্ণ কল্পিত একটি কাহিনীকে বিশ্বাসযোগ্য ভিত্তির উপর দাঁড় করানোর কঠিন দায়িত্ব তিনি যথাসাধ্য পালন করেছিলেন বলেই আমাদের ধারণা। তুর্কী বিজয়ের ঘটনাটি একেবারে মিথ্যা বলে প্রতিপন্ন করার চেষ্টাটি হাস্যকর হোত। 'রংপুর দর্পণ' সম্পাদক আদর্শ কল্পনার কথা চিন্তা করেছিলেন। কল্পনাই যখন, তাতে যতখুশী আদর্শগত উচ্চতার প্রশ্রয় দেওয়ার পক্ষপাতী ছিলেন তিনি। তাই ভীরু লক্ষ্মণসেনের ঐতিহাসিক স্বভাবসম্মত চরিত্র রচনার জন্য বঙ্কিমচন্দ্রকে দোষারোপ করেছিলেন,

"হিন্দু ভীরু নয়, বাঙ্গালী ভীরু ছিল না, প্রাণের মমতা তাঁহাদিগের অনভ্যস্ত, একান্ত অবিদিত। প্রাণিরক্ষার জন্য, 'গোব্রাহ্মণহিতের জন্য' পতিব্রতার পাতিব্রত্যের ও দেবপ্রতিমারক্ষার জন্য হিন্দু সহাস্যমুখে অনায়াসে মৃত্যুকে আলিঙ্গন করিতে পারে। সেই হিন্দুর আদর্শ রাজা লক্ষ্মণসেনের এইরূপ ঘৃণিত চিত্রের উদ্‌ঘাটন করিয়া বঙ্কিমচন্দ্র জাতীয় চরিত্রে কলঙ্করোপ করিয়াছেন, সন্দেহ নাই।" [ঐ, পৃঃ ১৮]

কিন্তু ইতিহাসের প্রতিবাদ করার জন্য ইতিহাস সমর্থিত যুক্তি না দেখিয়ে নিছক কল্পনার আশ্রয় নেওয়ার কথা চিন্তা করেননি বঙ্কিমচন্দ্র। ইতিহাস যে ঘটনার বিবরণ বিকৃত করেছে,—তাকে যথাযোগ্য সত্য মর্যাদাদানের সংকল্প গ্রহণ করেছিলেন তিনি। তাই লক্ষ্মণসেনের পরাজয় কাহিনী অস্বীকার না করে যথার্থ দুর্বলতার

হেতুটি নির্ণয় করার প্রয়াস পেয়েছিলেন। বৃদ্ধত্ব ও নৈরাশ্যের মাঝখানে যাঁরা রাজাকে সাহস ও শক্তি জোগাতে পারত সেই পশুপতি প্রমুখ চরিত্র তখন স্বীয় স্বার্থচিন্তায় মগ্ন। সামগ্রিকভাবে একটি জাতির ঐক্যবোধ ও স্বাধীনতাস্পৃহার উল্লেখযোগ্য অবনতি না ঘটলে পতন এত দ্রুত হতে পারে না। ঐতিহাসিক এই সিদ্ধান্ত আমরা অস্বীকার করব কি করে? বঙ্কিমচন্দ্র 'মৃণালিনীতে' খুব বিচক্ষণতার সঙ্গেই অকপট সত্য নির্ণয়ের চেষ্টা করেছিলেন। বাংলার সেই দুর্যোগের দিনে ইতিহাস যেখানে অশ্রদ্ধেয় ও বিকৃত তথ্য পরিবেশনে তৎপর বঙ্কিমচন্দ্র আপন প্রতিভাবলে তার ওপরে আলোকসম্পাতের চেষ্টা করেছিলেন। সিদ্ধান্তের ওপরে টাকাটিপ্পনী না করে ঘটনাটিকে তিনি কল্পনার সাহায্যে প্রচারের চেষ্টা করেছিলেন। তাই হেমচন্দ্র স্বদেশপ্রাণ হয়েও আত্মচিন্তায় মগ্ন, পশুপতির মধ্যে সদ্‌গুণের সমাবেশ থাকা সত্ত্বেও সে পথভ্রান্ত। বাংলার আকাশে অন্ধকার ঘনিয়ে আসার আগে ছায়াশরীরী এসব কাল্পনিক চরিত্র রচনায় বঙ্কিমচন্দ্র যথেষ্ট কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন। এদের দেখে মন ক্ষুব্ধ হয়,—আপন অযোগ্যতার জন্য বেদনাবোধ জাগ্রত হয়। বঙ্কিমচন্দ্র বোধহয় এমনি করেই আত্মসমালোচনার সোপান প্রস্তুত করতে চেয়েছিলেন। আমাদের ভ্রান্তির রন্ধ্রপথে একদা যা ঘটেছিল—তার সম্বন্ধে সচেতন হওয়ার দিন এসে গেছে, স্বদেশপ্রাণ বঙ্কিমচন্দ্র তা বুঝেছিলেন। সমালোচক শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় 'বঙ্গ সাহিত্যে উপন্যাসের ধারায়' 'মৃণালিনী' সম্বন্ধে বলেছেন,—

"হেমচন্দ্র, মাধবাচার্য, পশুপতি, লক্ষ্মণসেন, শান্তশীল—একটা বিশাল রাজনৈতিক সংকটের সন্ধিস্থলে এই সমস্ত অশরীরী প্রেতমূর্তিই জাতির ভাগ্যনিয়ন্তা, ইহা ভাবিতে মন একটা ক্ষুব্ধ অতৃপ্তি ও অবিশ্বাসের ভাবে পীড়িত হইতে থাকে—তাহারা বিশাল মুসলমান প্লাবন তরঙ্গের উপর ক্ষণস্থায়ী বুদ্‌বুদের মতই প্রতীয়মান হয়।"[১৫]

এই অবিশ্বাস্য ষড়যন্ত্রের প্রতিক্রিয়া সমগ্র জাতির প্রাণে সঞ্চার করার ইচ্ছা পোষণ করেছিলেন ঔপন্যাসিক। বাঙ্গালীর রাজনৈতিক স্বাধীনতা বিলুপ্তির লগ্নে সামগ্রিক দুর্বলতা জাতিকে গ্রাস করেছিলো,—মর্মান্তিক হলেও একথা সত্য। তাই 'মৃণালিনী' উপন্যাসকে শুধু কল্পনাশ্রয়ী বা রোম্যান্টিক উপন্যাস না বলে এর সত্যতার ভিত্তিকে স্বীকার করা দরকার। আত্মদোষ অস্বীকারের হীনতা থেকে বঙ্কিমচন্দ্র বাঙ্গালী জাতিকে রক্ষা করেছিলেন এই উপন্যাসে। স্বাধীন ভারতবর্ষের পটভূমিকায় বঙ্কিমচন্দ্রের অতীতকীর্তির আলোচনায় এ জাতীয় মহিমা আরও বেশী উজ্জ্বল বলে মনে হয়। যদিও সে যুগের বাঙ্গালী উদ্দীপনার মুহূর্তে এ উপন্যাসের

১৫. শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা, মৃনালিনী প্রসঙ্গে আলোচনা, পৃঃ ৭৫।

উত্তেজনার অংশ থেকে যথেষ্ট প্রেরণা পেয়েছে,—হেমচন্দ্রের দুর্বলতার বিচার না করে —তাঁর বীরত্বের-শৌর্যের দ্বারাই প্রভাবিত হয়েছে, উপন্যাসের ফলাফল নিয়ে মাথা ঘামানোর সময় ছিল না কারো।

বঙ্কিমচন্দ্র নিছক ভাববিলাস ও বায়বীয় উচ্ছ্বাসকে বরাবরই নিন্দনীয় বস্তু বলেই সমালোচনা করেছেন। তাঁর স্বদেশচিন্তা যুক্তি ও চিন্তাশক্তি দুটিকেই অবলম্বন করেছে। কায়িক বলের ওপরে জোর না দিয়ে মানসিক দৃঢ়তাকেই স্বদেশপ্রেমের বড়ো সম্বল বলে মনে করেছিলেন তিনি। তাঁর সমগ্র স্বদেশপ্রেমমূলক উপন্যাসের নায়কবৃন্দ মানসিক জটিলতার আবর্তে পড়েই আজীবনের স্বপ্ন ও সাধনাকে বিসর্জন দিয়েছেন। "মৃণালিনী" উপন্যাসেই প্রথম বাঙ্গালীর চারিত্রিক দুর্বলতা ও হিন্দুশক্তির পরিকল্পনাবিহীন দেশাত্মবোধের চিত্র অঙ্কন করেছেন। নিছক বায়বীয় উচ্ছ্বাসের পরিণাম কি হতে পারে,—বঙ্কিমচন্দ্র এখানে সেই সত্যটিই তুলে ধরেছিলেন। তবু হেমচন্দ্র ও মাধবাচার্য যে আমাদের সশ্রদ্ধ দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন তাতে কোন সন্দেহ নেই। অসংখ্য ত্রুটি থাকা সত্ত্বেও 'মৃণালিনী' সে যুগের জনপ্রিয় উপন্যাস।

'মৃণালিনীর' প্রথমাংশেই পূর্ব ভারতের দুর্যোগের চিত্র অঙ্কিত হয়েছে। মগধ রাজপুত্র হেমচন্দ্র পিতৃরাজ্য উদ্ধারের জন্য চেষ্টারত। কিন্তু শত্রু হত্যায় বীরত্ব প্রদর্শন করাই হেমচন্দ্রের আদর্শ।

আমি কি চোরের মত বিনাযুদ্ধে শত্রু মারিব? আমি মগধ বিজেতাকে যুদ্ধে জয় করিয়া পিতার রাজ্য উদ্ধার করিব। নহিলে আমার মগধ—রাজপুত্র নামে কলঙ্ক।

[১ম খণ্ড, ১ম পরিচ্ছেদ]

এই উক্তির মধ্যে যথেষ্ট বীররস আছে—হেমচন্দ্রের দৃঢ়তা ও সাহসের অনবদ্য প্রকাশ এখানে দেখি। কিন্তু হেমচন্দ্রের এই পৌরুষ ও বীর্যের অন্তরালে দুর্বলতার স্বরূপটিও লেখক পরক্ষনেই ব্যক্ত করেছেন। মাধবাচার্য তাকে সস্নেহ তিরস্কার করেছেন,—

"তুমি দেবকার্য না সাধিলে কে সাধিবে? তুমি যবনকে না তাড়াইলে কে তাড়াইবে? যবন নিপাত তোমার একমাত্র ধ্যান স্বরূপ হওয়া উচিত। এখন মৃণালিনী তোমার মন অধিকার করিবে কেন?" [ঐ]

মাধবাচার্য দেশরক্ষার পবিত্র কর্তব্যকে দেবকার্য বলেছেন। দেশসচেতন করে তোলার জন্যই প্রিয় শিষ্য হেমচন্দ্রকে তিনি তীব্র ভাষায় তিরস্কার করেছেন। মাধবাচার্য গণনা করে দেখেছেন,—"যখন পশ্চিমদেশীয় বণিক বঙ্গরাজ্যে অস্ত্রধারণ করিবে তখন যবন রাজ্য উৎসন্ন হইবেক।"

এই ইঙ্গিতময় বক্তব্যটি ব্যাখ্যা করে মাধবাচার্য হেমচন্দ্রের ওপরেই যবনরাজ্য ধ্বংসের দায়িত্ব দিয়েছেন। মাধবাচার্যের আদেশ অমান্য করার উপায় ছিল না হেমচন্দ্রের,—কিন্তু প্রেমচিন্তা এই ব্যক্তিটির সমগ্র ব্যক্তিত্বকেই প্রায় আচ্ছন্ন করে ফেলেছিল। শক্তিমান হয়েও হেমচন্দ্র তাই দেশরক্ষার মহৎ নেতৃত্ব পালন করতে পারেননি। একই সঙ্গে বীরত্ব ও দুর্বলতা হেমচন্দ্রকে কখনও উদ্দীপ্ত কখনও বা ম্রিয়মান করেছে। উপন্যাসের নায়ক হিসেবে হেমচন্দ্র কিছুটা দৃষ্টি আকর্ষণ করলেও স্বদেশপ্রেমিক বীর চরিত্রের মর্যাদা কিছুতেই হেমচন্দ্রকে দেওয়া যায়না। বঙ্কিমচন্দ্র পাঠককে প্রথম থেকেই সে বিষয়ে সচেতন করার চেষ্টা করেছেন। তবু যে হেমচন্দ্র সেযুগে আদর্শ চরিত্র হিসেবে গৃহীত হয়েছিল তার কারণ যবন উৎপাটনের সদিচ্ছা একদা তিনিই উচ্চরবে ঘোষণা করেছিলেন।

'মৃণালিনী' উপন্যাসের পটভূমিকায় বিদেশী শত্রুসৈন্যের আবির্ভাব পাঠককে কৌতূহলী করে। রাজা লক্ষ্মণসেন বৃদ্ধত্বে উপনীত, বার্ধক্যহেতু শত্রুর হাতে রাজ্য তুলে দেওয়ার যে ঘৃণ্য প্রস্তাবটি তিনি উচ্চারণ করেছিলেন তাতে মর্মাহত হয়েছিল সভাস্থল,—মাধবাচার্য ক্রন্দন করেছিলেন। মাধবাচার্যের এই দেশানুভূতি পাঠকের চিত্তকে দ্রব করেছে। বৃদ্ধ লক্ষ্মণসেনের অসহায় মূর্তি আমাদের করুণা সঞ্চার করেনি কিন্তু দুরভিসন্ধি থাকা সত্ত্বেও পশুপতি শত্রুদমনের আয়োজন করে স্বদেশ-প্রেমিকতার জোরে আমাদের সমর্থন লাভ করেছেন। শত্রুদূতের কাছে চতুর রাজনীতিজ্ঞ পশুপতি বলেছিলেন,—

'আমি এ রাজ্য তাঁহার হস্তে সমর্পণ করিব কি না, তাহা অনিশ্চিত। স্বদেশ-বৈরিতা মহাপাপ। আমি এ কর্ম কেন করিব?' [ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ, ২য় খণ্ড]

আবার দুরভিসন্ধিপরায়ণ পশুপতি আবেগভরে গৃহদেবী অষ্টভূজা মূর্তির কাছে প্রণাম জানিয়ে বলেছে,—

"আমি অকূলসাগরে ঝাঁপ দিলাম, দেখিও মা! আমায় উদ্ধার করিও। আমি জননীস্বরূপা জন্মভূমি কখনও দেবদ্বেষী যবনকে বিক্রয় করিব না।"

[সপ্তম পরিচ্ছেদ ২য় খণ্ড]

পশুপতির স্বার্থবোধ এ চরিত্রের সমস্ত সদগুণ বিনষ্ট করেছে। মাধবাচার্যের সুপরামর্শও পশুপতি অগ্রাহ্য করেছে। এ বঙ্গভূমিকে জননীস্বরূপা মনে করেও পশুপতি নির্বোধের মত যবনের হাতেই তা সমর্পণ করেছে। সর্বোপরি মগধ ও বঙ্গকে একত্রিত করে শত্রু সৈন্যকে বিতাড়িত করার সুপরামর্শ অগ্রাহ্য করে পশুপতি হেমচন্দ্রকেও বিপদগ্রস্ত করেছে। তথাপি এ চরিত্রটি সম্বন্ধে ঔপন্যাসিকের কিঞ্চিৎ সহানুভূতি ছিল,—

"যে ব্যক্তি রাখিলে গৌড় রাখিতে পারিত, সে ঊর্ণনাভের ন্যায় বিরলে বসিয়া অভাগা জন্মভূমিকে বদ্ধ করিবার জন্য জাল পাতিতেছিল।"

[১ম পরিচ্ছেদ, চতুর্থ খণ্ড]

বঙ্কিমচন্দ্রের এ ক্ষোভের সীমা নেই। অতীত ইতিহাসের এই কলঙ্কজনক ইতিবৃত্তের বর্ণনা দিতে গিয়ে তাই তিনি বেদনার্ত।

ইতিহাসবর্ণিত যে ঘটনার সত্যতায় বঙ্কিমচন্দ্র সন্দেহ প্রকাশ করেছিলেন, বঙ্গদেশ বিজয়ী সেই সপ্তদশ অশ্বারোহীর প্রসঙ্গটি বঙ্কিমচন্দ্র এ উপন্যাসের যবনদূত-যমদূত অংশে বিস্তৃতভাবে আলোচনা করেছেন। পশুপতির মন্ত্রণানুসারেই এই ব্যবস্থা হয়েছিল, নতুবা সপ্তদশ অশ্বারোহীর পক্ষে যথার্থ যুদ্ধে অংশগ্রহণ করে বিজয়ী হওয়াটা অসম্ভব ছিল, এ কথা প্রমাণের জন্যই পশুপতি চরিত্রটি কল্পনা করেছিলেন তিনি।

বঙ্গদেশ শত্রুকরতলগত হল। এখানে বঙ্কিমচন্দ্র ঔপন্যাসিকের দায়িত্ব বিস্মৃত হয়ে আত্মপ্রকাশ করেছেন। গৌড়ের স্বাধীনতা বিলুপ্তির এই হৃদয়বিদারক অংশটি বর্ণনাকালে বঙ্কিমচন্দ্রের পক্ষে আত্মগোপন বা আত্মসংযম পালন করা কোনমতেই সম্ভব ছিল না। বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর এই মনোবেদনা প্রকাশ করেছিলেন এভাবে,

"সেই রাজকুলকলঙ্ক, অসমর্থ রাজার সঙ্গে গৌড়রাজ্যের রাজলক্ষ্মীও যাত্রা করিলেন। ষোড়শ সহচর লইয়া মর্কটাকার বখ্‌তিয়ার খিলিজি গৌড়েশ্বরের রাজপুরী অধিকার করিল।"

[চতুর্থ পরিচ্ছেদ, ৪র্থ খণ্ড]

লক্ষ্মণসেনের উপযুক্ত বিশেষণই দান করেছেন বঙ্কিমচন্দ্র, কারণ উপন্যাসে তাঁর কলঙ্কিত আচরণের দৃষ্টান্ত রয়েছে। রাজ্যবিজয়ী বখ্‌তিয়ারের বিশেষণটি সে তুলনায় লঘু। যে আমাদের প্রিয়জন, আশা ভরসার স্থল, কর্তব্যপালনে বিমুখ হলে তাঁকে নিষ্ঠুরভাবে সমালোচনা কেবল আমরাই করতে পারি।

ঔপন্যাসিক বঙ্কিমচন্দ্র সমালোচকের আসনে উপবিষ্ট হয়ে মন্তব্য করেছেন, "ষষ্টি বৎসর পরে যবন ইতিহাসবেত্তা মিন্‌হাজউদ্দীন এইরূপ লিখিয়াছিলেন। ইহার কতদূর সত্য, কতদূর মিথ্যা তাহা কে জানে? যখন মনুষ্যের লিখিত চিত্রে সিংহ পরাজিত, মনুষ্য সিংহের অপমান কর্তা স্বরূপ চিত্রিত হইয়াছিল, তখন সিংহের হস্তে চিত্রফলক দিলে কিরূপ চিত্র লিখিত হইত? মনুষ্য মূষিকতুল্য প্রতীয়মান হইত সন্দেহ নাই। মন্দভাগিনী বঙ্গভূমি সহজেই দুর্বলা, আবার তাহাতে শত্রুহস্তে চিত্রফলক।"

এই ক্ষোভ ও দুঃখ নিবারণের জন্যই 'মৃণালিনীর' পরিকল্পনা কিন্তু উপন্যাসেও বাস্তবতা সৃষ্টি করতে গিয়ে শিহরিত হয়েছিলেন তিনি। আমাদের জাতীয় দুর্বলতার বিষময় পরিণতি নতুন করে তাঁকে বেদনার্ত করেছে। পশুপতির অদূরদর্শিতার ভয়াবহ ফলাফল সম্বন্ধে কৈফিয়ৎ দিয়েছিলেন বঙ্কিমচন্দ্র,

আমরা পাঠক মহাশয়ের নিকট পশুপতিকে বুদ্ধিমান বলিয়া পরিচিত করিয়াছি। পাঠক মহাশয় বলিবেন, যে ব্যক্তি শত্রুকে এতদূর বিশ্বাস করিল, সহায়হীন হইয়া তাহাদিগের অধিকৃত পুরীমধ্যে প্রবেশ করিল, তাহার চতুরতা কোথায়? কিন্তু বিশ্বাস না করিয়া কি করেন। এ বিশ্বাস না করিলে যুদ্ধ করিতে হয়। উর্ণনাভ জাল পাতে, যুদ্ধ করে না। [পঞ্চম পরিচ্ছেদ, ৪র্থ খণ্ড]

বঙ্কিমচন্দ্রের এই কৈফিয়ৎটির নানা সমালোচনার প্রসঙ্গে পূর্বে আলোচনা করেছি। বঙ্কিমচন্দ্রের কল্পনা কতটা নিখুঁত হলে আমরা খুশী হতাম আপাততঃ সে প্রসঙ্গ অবান্তর। পশুপতিকে নিছক পশু চরিত্ররূপে দেখালে আমরা সন্তুষ্ট হতাম কি না কে জানে। তবে স্বার্থসিদ্ধির জন্য সচেতন পশুপতি যথেষ্ট দক্ষতা থাকা সত্ত্বেও যে সর্বনাশা কর্মজালে জড়িয়ে পড়লেন সেই চিত্রটি রচনায় বঙ্কিমচন্দ্র যে সত্যিই দক্ষতা দেখিয়েছিলেন তাতে আমরা নিঃসন্দেহ। পশুপতি চরিত্রে স্বার্থপরতা ও নীচতা যতই থাক না কেন বঙ্কিমচন্দ্র নিজে ছিলেন স্বদেশপ্রেমী। ইতিহাসের ব্যর্থতা থেকে তিনি ভবিষ্যতের আশার দীপটি জ্বালিয়ে নিতে চান। এই দুঃখের অনুভব নিয়েও বঙ্কিমচন্দ্র আলোকিত ভবিষ্যতের স্বপ্ন দেখেছিলেন,—"নবদ্বীপ জয় সম্পন্ন হইল। যে সূর্য সেইদিন অস্তে গিয়াছে, আর তাহার উদয় হইল না। আর কি উদয় হইবে না? উদয় অস্তও স্বাভাবিক নিয়ম!"

'মৃণালিনী' উপন্যাসের নায়ক হেমচন্দ্রকেই সর্বাপেক্ষা নিষ্প্রভ মনে হয়। স্বদেশোদ্ধারের প্রেরণা যদি স্বতঃস্ফূর্ত না হয়ে আরোপিত হয়—তার আবেগও যে অত্যন্ত স্তিমিত হবে তা সহজেই বোঝা যায়। মৃণালিনী ধ্যানমগ্ন হেমচন্দ্রকে স্বদেশপ্রেমিকের ভূমিকায় তাই বেমানান লাগে। শত্রু অধিকৃত নবদ্বীপে যুদ্ধসাজে সজ্জিত হয়ে হেমচন্দ্র একবার যুদ্ধোদ্যম করেছিলেন কিন্তু তৎক্ষণাৎ নিরস্ত হয়েছিলেন। তিনি ভেবেছিলেন,—

"একটি একটি যবন মারিয়া কি করিব? যবন যুদ্ধ করিতেছে না যবনবধেই বা কি সুখ? বরং গৃহীদের রক্ষার সাহায্যে মন দেওয়া ভাল।"

[সপ্তম পরিচ্ছেদ, ৪র্থ খণ্ড]

মৃণালিনী লাভের সাধনায় মনোনিবেশ করেছিলেন হেমচন্দ্র সুতরাং তাঁর সেই বাসনা পূর্তির জন্যই যাবতীয় ঘটনাজালের পরিকল্পনা করেছেন ঔপন্যাসিক। স্বদেশপ্রেমের আন্তরিক পরিচয় দিতে পারেননি বলে হেমচন্দ্রের ওপর দোষারোপ করাটা অর্থহীন।—মাধবাচার্যই নির্বাচনে ভুল করেছিলেন বলেই আমাদের ধারণা। মাধবাচার্যের ভ্রান্তি কিন্তু তখনও কাটেনি। যবনেরা নবদ্বীপ অধিকার করেছে বটে—মাধবাচার্যের দুরাশা তখনও দমিত হয়নি,—

"যবনেরা নবদ্বীপ অধিকার করিয়াছে বটে, কিন্তু নবদ্বীপ ত গৌড় নহে। প্রধান রাজা সিংহাসন ত্যাগ করিয়া পলায়ন করিয়াছেন। কিন্তু এই গৌড়রাজ্যে অনেক করপ্রদ রাজা আছেন ; তাহারা ত এখনও বিজিত হয়েন নাই। কে জানে যে, সকল রাজা একত্র হইয়া প্রাণপণ করিলে, যবন বিজিত না হইবে ?"

[দ্বাদশ পরিচ্ছেদ, ৪র্থ খণ্ড]

এই শুভসঙ্কল্প জাগ্রত করা মাধবাচার্যের পক্ষে সম্ভব ছিল না। সে যুগের পটভূমিকায় এমন চিন্তাও প্রায় অসম্ভব ছিল। মাধবাচার্যের প্রযত্নেও হেমচন্দ্র ও পশুপতি একত্রিত হয়ে যবন বিতাড়নের চেষ্টা করেননি। সুতরাং এর চেয়েও মহৎ আশার স্বপ্ন দেখাটাই আশ্চর্যের ব্যাপার। সম্ভবতঃ এই যুক্তি ঔপন্যাসিক বঙ্কিমচন্দ্রের। ইতিহাসের অস্বস্তিকর বিবরণকে বিশ্লেষণ করতে গিয়ে বঙ্কিমচন্দ্র নতুন করে আমাদের দোষত্রুটি ও অনৈক্যের ইতিহাস আবিষ্কার করলেন। এই আত্মবিশ্লেষণের ফলে নতুন করে আঘাত পাওয়া ছাড়া অন্য কিছু লাভ হয়নি তাঁর। তবে এই জাতীয় বিশ্লেষণের চেষ্টা করে বঙ্কিমচন্দ্র বাঙ্গালী জাতির প্রতি আন্তরিক প্রীতির পরিচয় দিয়েছেন। স্বদেশপ্রেমিক বঙ্কিমচন্দ্রের প্রথম আত্মপ্রকাশ 'মৃণালিনীতেই'। অনেকের মতোই সমালোচক অক্ষয়চন্দ্র দত্তগুপ্ত স্বীকার করেছেন,—

"ভবিষ্যতে কোনও কোনও গ্রন্থে যে বঙ্কিমচন্দ্র অতুলনীয় স্বদেশভক্তির পরিচয় দিয়াছেন, 'মৃণালিনী'তে তাহার সূচনা দেখা যায়। সপ্তদশ পাঠান অশ্বারোহী এই বাঙ্গলা দেশটাকে একদিনে জয় করিল বলিয়া যে আখ্যান ইতিহাসে স্থান পাইয়াছে উহার অযৌক্তিকতার বিরুদ্ধে বঙ্কিমই বোধ হয় প্রথম লেখনী ধারণ করেন।"[১৬]

কোন একজন ঔপন্যাসিক সম্পর্কে এই শ্রদ্ধেয় উক্তিই স্বাদেশিকতার চরম প্রমাণ। যিনি রসসৃষ্টির ও রসদৃষ্টির পরিচয় দিতে গিয়েও স্বাদেশিকতার স্বতঃস্ফূর্ত স্বাক্ষর রেখেছেন তাঁর অসামান্য কৃতিত্বের পরিমাপ সাধারণ সাহিত্যিকের মানদণ্ডে চলতে পারে না। তাই বঙ্কিমচন্দ্রকে সাধারণ নিয়মে বিচার করতে গিয়েই ভুল করি আমরা। উপন্যাসে বাঙ্গালী জীবনচিত্র ফোটানোর জন্য বঙ্কিমচন্দ্র ইতিহাস থেকে অধুনা পর্যন্ত যথার্থ বাঙ্গালী চরিত্র খুঁজে বেড়িয়েছিলেন। দেশপ্রীতির আবেগে এই অনুসন্ধানের তৃষ্ণা উত্তরোত্তর বেড়েই গিয়েছিল। বঙ্কিমচন্দ্র বাঙ্গালীর দুর্বলতার অপবাদ ও গ্লানি ঘোচাতে চেয়েছিলেন,—কিন্তু তা যে সম্ভব নয় এ সত্যও তাঁর অভিজ্ঞতালব্ধ আবিষ্কার। ঐতিহাসিক বিবরণের যথার্থ রূপ বজায় রাখা উপন্যাসে অবান্তর চেষ্টা বলে ইতিহাসের স্পর্শ থেকে চরিত্রগুলোকে গ্রহণ করেও উপন্যাসে তাকে জীবন্ত করে

১৬. অক্ষয়চন্দ্র দত্ত, বঙ্কিমচন্দ্র, ১৩২৭, পৃঃ ১৭৪।

তোলার শৈল্পিক চেষ্টা থেকে বঙ্কিমচন্দ্র বিরত হননি। 'মৃণালিনীর' পরেই বঙ্কিমচন্দ্র অধুনাতন সমস্যা নিয়ে সামাজিক উপন্যাস রচনায় মন দিলেন। 'বিষবৃক্ষ' থেকে 'কৃষ্ণকান্তের উইল' পর্যন্ত বঙ্কিমচন্দ্র সে চেষ্টাই করেছেন,—শুধু 'চন্দ্রশেখরই' তার ব্যতিক্রম।

দেশপ্রেমিকতা বঙ্কিমচন্দ্রকে ঔপন্যাসিক হিসেবে পৃথক মর্যাদাদান করেছে 'চন্দ্রশেখরেও' সে পরিচয় মিলবে। 'দুর্গেশনন্দিনী' ও 'মৃণালিনীতে' প্রত্যক্ষ স্বদেশপ্রীতির পরিচয় পেয়েছি আমরা। বঙ্কিমচন্দ্র অতীত ইতিহাসের অনালোকিত অধ্যায়কে উজ্জ্বল করার চেষ্টা করেছিলেন,—চন্দ্রশেখরে ঠিক সেজাতীয় কোন উদ্দেশ্য ছিল না। কোন বিশেষ উদ্দেশ্যের প্রতি একনিষ্ঠতা ঔপন্যাসিকের লক্ষ্যণীয় ত্রুটি বলেই সমালোচনা করা হয়ে থাকে। 'মৃণালিনী'তে সে চেষ্টা লক্ষ্য করেছি আমরা। 'চন্দ্রশেখরে' বঙ্কিমচন্দ্র শিল্পসৃষ্টির মুখ্য দায়িত্ব পালন করেছেন,—চরিত্রসৃজন ও নিপুণ মনোবিশ্লেষণে প্রথম শ্রেণীর শিল্পীর নিষ্ঠাই এ উপন্যাসের সর্বত্র লক্ষ্যণীয়। মানব-চরিত্রের অতলগভীর রহস্যে অবগাহন করে বঙ্কিমচন্দ্র মানবজীবনের চূড়ান্ত ব্যর্থতার চিত্র অঙ্কন করেছেন এখানে। স্বদেশপ্রীতির মত নিতান্তই সাময়িক উত্তেজনা থেমে গেলেও এ উপন্যাসের বক্তব্য পাঠক আগ্রহভরে পাঠ করবে। এই উপন্যাসেও বঙ্কিমচন্দ্র স্বতঃসিদ্ধরূপে ইতিহাসের সংশ্রব রক্ষা করেছেন। এ সম্পর্কে সমালোচক শ্রীসজনীকান্ত দাস ও শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছিলেন,—"বাঙ্গালীর বীরত্ব ও মহত্ত্ব প্রদর্শনের বাসনা বরাবরই তাঁহার মনে জাগরূক ছিল। কিন্তু নিজের পারিপার্শ্বিক সমাজ জীবনের মধ্যে তাহার বিশেষ স্ফূর্তি তিনি দেখিতে পান নাই সুতরাং তিনি আবার অতীতের দিকে দৃষ্টি ফিরাইয়া ছিলেন। ইতিহাসের আশ্রয় তাহার বিশেষ প্রয়োজন ছিল না; রমানন্দ স্বামী, চন্দ্রশেখর, প্রতাপ এবং রামচরণ তাঁহারই মানসপুত্র, ইতিহাসের পটভূমিকায় তাহাদিগকে সজীবতা দিবার জন্যই বঙ্কিমচন্দ্র মীরকাশিমের সহিত ইংরেজের সংঘর্ষ কাহিনীকে অবলম্বন করিয়াছিলেন।"

[ভূমিকা, 'চন্দ্রশেখর', বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ প্রকাশিত]

ইংরেজ অধিকারের পর বাংলাদেশের রাজনৈতিক অবস্থা এ উপন্যাসে পটভূমিকা-রূপে চিত্রিত হয়েছে। সিরাজদ্দৌলার পতনের পর মীরকাশেমের উত্থানে বাংলার ভাগ্যাকাশে যে ক্ষণিক আশার আলো দেখা গিয়েছিল বঙ্কিমচন্দ্র সেই সময়টিকে উপন্যাসের কাল হিসেবে বেছে নিয়েছেন। যদিও মূল ঘটনার সঙ্গে ইতিহাসের এই সংযোগটুকু না রাখলে উপন্যাসের কতখানি ক্ষতিবৃদ্ধি হোত সেটা পৃথক আলোচনার বস্তু। ইতিহাসের এই অধ্যায়টুকুর আলোচনা প্রসঙ্গেই বঙ্কিমচন্দ্রের দেশচর্চার সুযোগ আমরা লাভ করেছি তাতে সন্দেহ নেই। ইংরেজশাসন সুপ্রতিষ্ঠিত হওয়ার আগেও

বাংলাদেশে শান্তি ছিল। কিন্তু বিদেশীশাসকের অত্যাচার যখন তীব্র হয়ে উঠত তখন তার প্রতিবাদে মাথা উচু করে দাঁড়াতে সাহস করত এমন অনেক শক্তিমান জমিদারও সেযুগে ছিল। শৈবলিনীর লরেন্স ফস্টরের হাতে ধরা পড়ার জন্য লরেন্স ফষ্টরের প্ররোচনা বা অত্যাচার কতটুকুই বা। কিন্তু প্রতাপের ক্রোধবহ্নি জ্বালিয়ে তোলার জন্য সেটুকুই যথেষ্ট ছিল। উপন্যাসের নায়ক প্রতাপ ইংরাজ-জাতিকে শত্রু বলে মনে করেছে,—যদিও তার পেছনে কারণটি নিতান্ত সঙ্গতিহীন। বঙ্কিমচন্দ্র এখানে প্রতাপের প্রতিপত্তি ও ক্ষমতার প্রসঙ্গটি অনাবশ্যকভাবে বর্ণনা করেছেন। নিতান্তই স্বজাতিপ্রীতি ছাড়া এ জাতীয় অনাবশ্যক বর্ণনার অন্য কোন হেতু নেই। প্রতাপকে সমগ্র বঙ্কিমউপন্যাসের আদর্শ চরিত্ররূপে মনে করেন অনেকে। কিন্তু সে প্রসঙ্গের অভ্যন্তরে না গিয়ে শুধু বাঙ্গালী বীর হিসেবে প্রতাপকে বঙ্কিমচন্দ্র যে ভাবে চিত্রিত করেছেন তাতে নিছক স্বাজাত্যাভিমান ছাড়া অন্য কিছু খুঁজে পাই না আমরা। দেশপ্রীতি ও জাতিপ্রীতি বঙ্কিমচন্দ্রকে কতখানি মোহগ্রস্ত করেছিল তার প্রমাণ হিসেবে এ অংশটুকুর বিশেষ মূল্য রয়েছে,—

প্রতাপ জমিদার এবং প্রতাপ দস্যু। আমরা যে সময়ের কথা বলিতেছি, সে সময়ের অনেক জমিদারই দস্যু ছিলেন। বাস্তবিক দস্যুবংশে জন্ম অগৌরবের কথা বলিয়া বোধ হয় না, কেন না, অন্যত্র দেখিতে পাই, অনেক দস্যুবংশজাতই গৌরবে প্রধান। [৪র্থ খণ্ড, ১ম পরিচ্ছেদ]

দস্যুতার স্বপক্ষে এই যুক্তিপ্রদর্শন শুধু প্রতাপের পরিচয়কে উজ্জ্বল করার উদ্দেশ্যেই যে বর্ণিত হয়েছে তাতে সন্দেহ থাকে না। প্রতাপকে বাঙ্গালী বীরের আদর্শরূপে দেখাবার উদ্দেশ্যেই বঙ্কিমচন্দ্র বলেছিলেন,

"তবে অন্যান্য প্রাচীন জমিদারের সঙ্গে প্রতাপের দস্যুতার কিছু প্রভেদ ছিল। আত্মসম্পত্তি রক্ষার জন্য বা দুর্দান্ত শত্রুর দমন জন্যই প্রতাপ দস্যুদিগের সাহায্য গ্রহণ করিতেন। অনর্থক পরস্বাপহরণ বা পরপীড়ন জন্য করিতেন না; এমনকি, দুর্বল বা পীড়িত ব্যক্তিকে রক্ষা করিয়া পরোপকার জন্যই দস্যুতা করিতেন। [ঐ]

এ জাতীয় যুক্তির আধিক্যে বঙ্কিমচন্দ্রের স্বাজাত্যাভিমানের উচ্ছ্বসিত প্রকাশ দেখা যায়। স্বদেশপ্রেমিক বঙ্কিমচন্দ্রকে এমনভাবে উপন্যাসে আবিষ্কার করায় কিছু মাত্র বিস্মিত হই না কারণ উপন্যাসে এ জাতীয় উচ্ছ্বাস বারংবারই লক্ষ্য করেছি। স্বদেশপ্রেমই বঙ্কিমচন্দ্রের ঔপন্যাসিক চিন্তাধারাকে এভাবে প্রভাবিত করেছিল, একথা অকপটে বলা চলে। প্রতাপের এই নির্ভীকতা ও বীরত্ব দেখেও তাঁকে আমরা স্বদেশপ্রেমিক বলতে পারি না। স্বদেশপ্রেমের কোন সূক্ষ্ম অনুভূতি তাঁর চরিত্রে ছিল না। ইংরেজবিদ্বেষ প্রতাপের চরিত্রে স্বদেশপ্রেমের প্রতিক্রিয়ারূপে

দেখানো হয়নি। অথচ ইংরেজজাতির বিরোধিতা করতেই মনস্থ করেছিলেন তিনি। শত্রুকে বিনাশ করার চেষ্টামাত্রকেই আমরা স্বদেশপ্রাণতা বলি না,—আরও গভীর দেশানুরাগের আবেগ থেকেই স্বদেশপ্রেমের জন্ম। সুতরাং প্রতাপের ইংরেজ-বিদ্বেষকে নিতান্তই সাময়িক অনুভব বলেই বর্ণনা করেছেন বঙ্কিমচন্দ্র।

'ইংরেজজাতি বাঙ্গালায় না আসিলে, শৈবলিনী লরেন্স ফষ্টরের হাতে পড়িত না। অতএব ইংরেজজাতির উপরও প্রতাপের অনিবার্য ক্রোধ জন্মিল। প্রতাপ সিদ্ধান্ত করিলেন ফষ্টরকে আবার ধৃত করিয়া, বধ করিয়া এবার অগ্নি সংকার করিতে হইবে—নহিলে সে আবার বাঁচিবে—গোর দিলে মাটি ফুঁড়িয়া উঠিতে পারে। দ্বিতীয় সিদ্ধান্ত এই করিলেন যে, ইংরেজ জাতিকে বাংলা হইতে উচ্ছেদ করা কর্তব্য ; কেননা, ইহাদিগের মধ্যে অনেক ফষ্টর আছে।' [ঐ]

'চন্দ্রশেখরে' বঙ্কিমচন্দ্র যেযুগের ইতিহাস অবলম্বন করেছিলেন তাতে স্বদেশোচ্ছ্বাস প্রকাশে যথেষ্ট সুযোগ ছিল। এখানে শাসক ইংরেজ ও রাজ্যচ্যুত মুসলমান শাসকের সংঘর্ষ পটভূমিকারূপে ব্যবহৃত হয়েছে—সমসাময়িক দেশপ্রেম প্রচারের যুগে এ পটভূমিকাকে বঙ্কিমচন্দ্র কাজে লাগাতে পারতেন। কিন্তু উপন্যাসের দাবীকে প্রতিষ্ঠা করার জন্য শৈবলিনী ও প্রতাপের মনোবিশ্লেষণেই মনোযোগ দিয়েছিলেন তিনি। এতে উপন্যাসের আকর্ষণ বেড়েছে এবং শিল্পী বঙ্কিমচন্দ্রের দক্ষতারই পরিচয় পেয়েছি। স্বদেশপ্রেমিক বঙ্কিমচন্দ্র এ উপন্যাসে সচেতন ভাবেই উপন্যাস রচনা করেছিলেন,—অন্য কোন উদ্দেশ্যের দ্বারা প্রভাবিত হননি। তবু কোথাও কোথাও স্বদেশপ্রাণতা তাঁকে আত্মবিস্মৃত করেছিল বলেই অপ্রাসঙ্গিক অংশগুলো উপন্যাসে অঙ্গ হয়ে উঠতে পারেনি। প্রতাপ শৈবলিনীর এ আখ্যায়িকার মাঝখানে মীরকাসিমের প্রসঙ্গটি নিতান্তই পটভূমিকারূপে ব্যবহৃত হলেও মীরকাসেম আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন তাঁর দেশপ্রেম নিয়ে। পরবর্তীকালে দেশোচ্ছ্বাসের বন্যায় যে সব স্বদেশ-প্রেমিকেরা নাটকের নায়করূপে আমাদের সামনে এসে দাঁড়িয়েছিলেন মীরকাসেম তাঁদের অন্যতম। বঙ্কিমচন্দ্রের কল্পনাতেই মীরকাসেমের দেশপ্রেম প্রথম ধরা পড়েছিল। ইংরেজের সঙ্গে যুদ্ধ করার পূর্বাহ্নে চিন্তান্বিত মীরকাসেমের উক্তি থেকেই তাঁর দেশভাবনার পরিচয় স্পষ্ট। বৃহৎ শক্তির সামনে দাঁড়িয়ে ভাবী সর্বনাশের মুখেও মীরকাসেম আত্মরক্ষা করতে চাননি, যুদ্ধ করতে চেয়েছিলেন,

"আমার আর উপায় নাই।...আমি নিশ্চিত জানি, এ বিবাদে আমি রাজ্যভ্রষ্ট হইব, হয়ত প্রাণে নষ্ট হইব। তবে কেন যুদ্ধ করিতে চাই ? ইংরেজেরা যে আচরণ করিতেছেন, তাহাতে তাহারাই রাজা, আমি রাজা নই। যে রাজ্যে আমি রাজা নই, সে রাজ্যে আমার প্রয়োজন ? কেবল তাহাই নহে। তাঁহারা বলেন, রাজা আমরা,

কিন্তু প্রজাপীড়নের ভার তোমার উপর। তুমি আমাদিগের হইয়া প্রজাপীড়ন কর, কেন আমি তাহা করিব? যদি প্রজার হিতার্থে রাজ্য করিতে না পারিলাম তবে সে রাজ্য ত্যাগ করিব, অনর্থক কেন পাপ ও কলঙ্কের ভাগী হইব? আমি সিরাজউদ্দৌলা নহি বা মীরজাফরও নহি।" [১ম খণ্ড, ১ম পরিচ্ছেদ]

এই উক্তি স্বদেশপ্রেমিকের। মীরকাসেমের এই বক্তব্য অন্ততঃ সেযুগের কাছে দেশপ্রেমের দৃষ্টান্ত রূপেই গৃহীত হবে। এই চরিত্রের দেশপ্রেম যে পরবর্তীকালে নাটকের উপাদান হতে পারে তা এই সামান্য উদ্ধৃতি থেকেই অনুমান করা সম্ভব। কিন্তু মীরকাসেম এ উপন্যাসের নায়ক নন,—প্রতাপ শৈবলিনীর ঘটনাটিকে ইতিহাস-সম্পৃক্ত করার উদ্দেশ্যেই মীরকাসেমকে পটভূমিকায় এনেছিলেন বঙ্কিমচন্দ্র। কিন্তু গৌণ চরিত্র হলেও মীরকাসেমের দৃঢ়তা ও দেশপ্রীতির অনাবিল পরিচয় পেয়েছি এ উপন্যাসে। শুধু তাই নয়, ইংরেজের রাজ্যলাভের মুহূর্তে সিরাজউদ্দৌলা ও মীরজাফরের মূর্খতা ও বিশ্বাসঘাতকার প্রসঙ্গটি ব্যাখ্যা করেছেন বঙ্কিমচন্দ্র। ইংরেজকে শত্রু বলে কল্পনা করার মত মানসিক দৃঢ়তাই মীরকাসেমের স্বাধীনচিত্ততার পরিচায়ক। 'চন্দ্রশেখরে' গুরগণ খাঁকে বিশ্বাসঘাতকের ভূমিকায় বর্ণনা করেছেন লেখক। অতিবিশ্বস্ত এই সেনাপতিও মীরকাসেমের কাছ থেকে কৌশলে রাজ্যলাভের বাসনা করেছিলো। এ চরিত্রটি আমাদের বিশ্বাসঘাতকতার ইতিহাসে অনায়াসে স্থান পেতে পারে। বঙ্কিমচন্দ্র কল্পনাবলে ইতিহাসের নিদারুণ সত্য উদ্‌ঘাটনের চেষ্টা করেছিলেন মাত্র। গুরগণ খাঁর স্বগতভাষণ থেকে আমরা সেযুগের কুটিল রাজনীতির বিশদ পরিচয় পেতে পারি। মীরকাসেম মসনদে আছেন এইমাত্র, ইংরেজের সঙ্গে তাঁর সম্পর্কটি ব্যাখ্যা করেছে গুরুগণ খাঁ,

"আমিই বাংলার কর্তা। আমি বাংলার কর্তা? কে কর্তা? কর্তা বড় উচ্চপদ! আমি বাংলার কর্তা না হই কেন? ইংরেজব্যাপারী—তাহাদের গোলাম মীরকাসেম; আমি কর্তার গোলামের গোলাম। কে আমার তোপের কাছে দাঁড়াইতে পারে? কিন্তু ইংরেজকে দেশ হইতে দূর না করিলে আমি কর্তা হইতে পারিব না। ...এখন মীরকাসেম মসনদে থাক, তাহার সহায় হইয়া বাংলা হইতে ইংরেজ নাম লোপ করিব।" [২য় খণ্ড, ২য় পরিচ্ছেদ]

গুরগণ খাঁর এ অভিসন্ধির গূঢ়ার্থ শুধু বিশ্বাসঘাতকতার অভিজ্ঞতায় অভ্যস্ত আমরাই এক নিমিষে অনুধাবন করতে পারি। গুরগণ খাঁ মীরজাফরের উত্তর সাধকমাত্র। বঙ্গইতিহাসের যে অধ্যায়টুকু আমরা মোটামুটি জানি বঙ্কিমচন্দ্র তারই চিত্র রচনা করেছেন এ উপন্যাসে। তবে এই অংশটুকু 'চন্দ্রশেখরের' উল্লেখযোগ্য কোন অধ্যায় নয়, শুধু পটভূমিকা মাত্র। কিন্তু ইতিহাসের একটা মুমূর্ষু মুহূর্তকে

বঙ্কিমচন্দ্র রূপায়িত করেছিলেন পরম যত্নে। ইতিহাসের সত্যকে তুলে ধরার ইচ্ছা থেকেই এ অংশের অবতারণা। তাই এ অংশে পলাশীর যুদ্ধের নায়ক সিরাজউদ্দৌলা, মীরজাফরকে সামনে আনেননি বটে কিন্তু কোন কোন সুনির্বাচিত উক্তির মধ্যে সেই স্মৃতি পুনর্জীবিত হয়েছে সন্দেহ নেই। মীরকাসেম নিজেকে সিরাজউদ্দৌলা ও মীরজাফরের থেকে পৃথক চরিত্র বলে মনে করেছিলেন।

'চন্দ্রশেখরে' ইংরেজের সঙ্গে মুসলমান ও হিন্দুর মিলিত সংঘর্ষ ঘটতে দেখি। যদিও এর পেছনে ব্যক্তিগত বিদ্বেষই সক্রিয় তবু সংঘর্ষ যখন শাসক ও শাসিতের মধ্যে বঙ্কিমচন্দ্রের পক্ষে তখন নিরপেক্ষ থাকা সম্ভব হয়নি। শাসক ইংরেজের উদ্ধত মনোভাব যে কোন একটি সাধারণ সেনাপতির মধ্যেও কি ভাবে সঞ্চারিত হয়েছিল, তাদের উক্তি থেকেই সেটুকু উদ্ধার করা যায়। আমিয়ট, ফস্টর শাসক ইংরেজের যোগ্য প্রতিনিধি। গুরগণ খাঁর কৌশলে যুদ্ধ যখন ধূমায়িত হল, গুরগণ খাঁ, প্রতাপ ব্যক্তিগত স্বার্থ উদ্ধারের জন্যই সক্রিয় অংশ নিলেন। প্রতাপের শৈবলিনী উদ্ধার এবং গুরগণ খাঁর মসনদস্বপ্ন এই যুদ্ধের অন্যতম কারণ। ফষ্টর সম্মুখ যুদ্ধের মুখোমুখি দাঁড়িয়েও কর্তব্য ঠিক করলেন,—তার ধারণা ও বিশ্বাসটি বঙ্কিমচন্দ্র এভাবে প্রকাশ করেছেন,—

তিনি পলাশীর যুদ্ধের পর ভারতবর্ষে আসিয়াছিলেন; দেশী লোকে যে ইংরেজকে লক্ষ্য করিবে, একথা তিনি মনে স্থান দিলেন না। বিশেষ ইংরেজ হইয়া যে দেশীশত্রুকে ভয় করিবে তাহার মৃত্যু ভাল। [২য় খণ্ড, ৫ম পরিচ্ছেদ]

পলাশীর যুদ্ধের পর থেকে শাসক ইংরেজ যদি এদেশবাসী সম্পর্কে এ জাতীয় ধারণাই পোষণ করে থাকে তবে খুব বেশী অবাক হবার কিছু নেই। বৃটিশ শাসন প্রতিষ্ঠার সময়ে আমাদের দুর্বলতার নির্ভুল হিসাব প্রতিপক্ষ নিয়েছিল নিশ্চয়ই। বঙ্কিমচন্দ্র শুধু সেই মনোভাবটি ব্যাখ্যা করেছেন—কিন্তু এর অন্তর্নিহিত ইঙ্গিত বুঝে নিতে সেযুগের আত্মসচেতন বাঙ্গালীর খুব বেশী অসুবিধে হয়নি। এভাবেই রাজনীতির জটিল রহস্য নিয়ে অবলীলাক্রমে নাড়াচাড়া করেছেন বঙ্কিমচন্দ্র; কোথাও বিস্তৃতি নেই,—অতিশয়োক্তি নেই, কিন্তু অভ্রান্ত লক্ষ্যবস্তুটি তিনি চিনিয়ে দিয়েছিলেন।

আমিয়টের নির্দেশে প্রতাপ রায়কে ধরার জন্য প্রতাপের বাড়ীতে উপস্থিত দুজন ইংরেজের মুখে একটি লক্ষ্যণীয় উক্তি শুনতে পাই। বন্ধ দরজায় পদাঘাতের নির্দেশ দিয়ে জনসন বলেছিল,

"অপেক্ষা কেন, লাথি মার, ভারতবর্ষীয় কবাট ইংরেজি লাথিতে টিকিবে না।"

[২য় খণ্ড, সপ্তম পরিচ্ছেদ]

পদাঘাতে কবাট ভেঙ্গে পড়ায় জনসন সদম্ভে বলেছে,—

"এইরূপে ব্রিটিশ পদাঘাতে সকল ভারতবর্ষ ভাঙ্গিয়া পড়ুক।" [ঐ]

এই বর্ণনায় আত্মশক্তি সঞ্চারের একটি পরোক্ষ চেষ্টা করেছিলেন বঙ্কিমচন্দ্র। ইতিহাসের সত্যই ভবিষ্যতের কর্মপন্থার নিয়ামক হোক, রুদ্ধশ্বাসে অপমান ও অপবাদ সহ্য করেও শক্তি সঞ্চয়ের জন্য উদ্যোগী হতে হবে, এ নির্দেশ স্বদেশপ্রেমিক বঙ্কিমচন্দ্রের। ইংরেজের চরিত্রে শিক্ষণীয় বস্তুটিও বঙ্কিমচন্দ্র আমিয়টের চরিত্রে দেখিয়েছেন। আত্মরক্ষা যে সম্মান রক্ষার চেয়ে বড়ো জিনিষ নয়—আমিয়টই সেকথা বলেছে,—

'যেদিন একজন ইংরেজ দেশী লোকের ভয়ে পলাইবে, সেইদিন ভারতবর্ষে ইংরেজ সাম্রাজ্য স্থাপনের আশা বিলুপ্ত হইবে। দাঁড়াইয়া মরিব সেও ভাল, তথাপি ভয় পাইয়া পলাইব না।' [পঞ্চম খণ্ড, ১ম পরিচ্ছেদ]

ইংরেজের জাতিগত এই গুণটি সেযুগের বাঙ্গালীরা অনুকরণ করতে প্রস্তুত হয়েছিল। আত্মদানের সাহস সমগ্র জাতির প্রাণে সেদিন অভূতপূর্ব শক্তিসঞ্চার করেছিল। আত্মরক্ষার ভীরুতা সমগ্র জাতির চরিত্রে কলঙ্কলেপন করবে, এই সত্যটি যেদিন আমরা বুঝতে সক্ষম হয়েছি,—তখনই বঙ্কিমচন্দ্র আমিয়টের চারিত্রিক বীরত্ব, অকুতোভয় হৃদয়টি আমাদের সামনে মেলে ধরলেন। জাতির জন্য, দেশের জন্য, নিজের প্রাণ তুচ্ছ করে মৃত্যুবরণ করেছে আমিয়ট,

"মরিব। আমরা আজি এখানে মরিলে ভারতবর্ষে যে আগুন জ্বলিবে, তাহাতে মুসলমান রাজ্য ধ্বংস হইবে। আমাদের রক্তে ভূমি ভিজিলে তৃতীয় জর্জের রাজপতাকা তাহাতে সহজে রোপিত হইবে।" [ঐ]

এই আত্মত্যাগের মহিমা ও নির্ভীকতাই মুষ্টিমেয় ইংরেজের সাফল্যের সূচনা করেছিল। বঙ্গ ইতিহাসের পরিচিত অধ্যায়টি উপন্যাসে যোজনাকালে বঙ্কিমচন্দ্র পূর্ণ নিরপেক্ষতার প্রমাণ রেখে যেতে পারেননি—কিন্তু যথাসম্ভব সত্যতা ও ঐতিহাসিকতাকে রক্ষা করার চেষ্টা করেছিলেন। লেখক ইংরেজের চরিত্রে প্রশংসনীয় দিকটি যেমন উদারভাবে বর্ণনা করেছেন,—মীরকাসেমের দেশপ্রেম বর্ণনাতেও তেমনি উচ্ছ্বসিত হয়েছেন। কিন্তু প্রতাপকে বাঙ্গালী বীর হিসেবে প্রতিষ্ঠা দিতে গিয়েই অতিশয়োক্তির আশ্রয় নিতে হয়েছে তাঁকে। প্রতাপ শৈবলিনীর উদ্ধারের জন্য যে অসমসাহসিকতা প্রদর্শন করেছিলেন, প্রকারান্তরে সে শক্তির মধ্যেই হিন্দুবীরের মহত্ত্ব ও শৌর্য অনুসন্ধানের চেষ্টা করেছেন বঙ্কিমচন্দ্র।

'দুর্গেশনন্দিনীর' পর 'মৃণালিনীতেই' বঙ্কিমচন্দ্র দেশপ্রাণতার সুস্পষ্ট পরিচয় দিয়েছেন। কিন্তু 'চন্দ্রশেখরে' সে চেষ্টা ছিল না কোথাও। কিন্তু দেশপ্রেমিক বঙ্কিমচন্দ্রের পরিচয় যেমন তাঁর সব রকমের রচনাতেই স্বচ্ছ হয়ে উঠেছে 'চন্দ্রশেখরে'ও সে আভাস মিলছে। ইংরেজের হাতে পলাশীর যুদ্ধে বাঙ্গালীর নতুন করে যে

ভাগ্যবিপর্যয় ঘটেছিলো সে কাহিনী স্মরণ করতে গিয়েও বঙ্কিমচন্দ্র বেদনার্ত হয়েছেন। শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় 'চন্দ্রশেখরের' সমালোচনায় যে কথাটি বলতে চেয়েছেন,—

"বৈদেশিক শক্তির অভিভবে আমাদের গার্হস্থ্যজীবনে যে বিক্ষোভ জাগিয়া উঠে, তাহাতে অন্তর্বিপ্লবের কোন গূঢ় সৌন্দর্য থাকে না, কেবল একটা বাহ্য ঘটনাবৈচিত্র্য থাকে মাত্র। আর অত্যাচারী ও অত্যাচারিত সংঘর্ষে, যেখানে একপক্ষ কেবল পাইবার লোভে আক্রমণ করিতেছে এবং অপরপক্ষ ব্যাকুল, দুর্বলভাবে অপ্রতিবিধেয় শক্তির বিরুদ্ধে আত্মরক্ষায় বৃথা চেষ্টা করিতেছে সেখানে আমাদের মনে বিচিত্র সৌন্দর্যবোধ অপেক্ষা করুণ রসেরই সমধিক উদ্রেক হইয়া থাকে।

[বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা, পৃষ্ঠা ৭৮]

প্রতাপ ও শৈবলিনীর কিংবা মীরকাশেম ও দলনীর প্রণয়চিত্রই উপন্যাসে মুখ্যভাবে স্থান পেয়েছে, কল্পনা রাজ্যের এই সব নরনারীর অন্তর্দ্বন্দ্বের বেদনার মাঝখানে লাঞ্ছিতা দেশমাতৃকার দুর্যোগের ও বিপর্যয়ের চিত্রও যে কোন সচেতন মানুষকে মুহূর্তের জন্য বিহ্বল করে দেবে,—এখানেই চন্দ্রশেখরের উভবিধ সার্থকতা।

'চন্দ্রশেখরের' পরে বঙ্কিমচন্দ্রের যে উপন্যাসটিতে দেশপ্রীতির প্রসঙ্গ আলোচিত হয়েছে তা হল 'রাজসিংহ'। ঐতিহাসিক উপন্যাসে বঙ্কিমচন্দ্র দেশচর্চার কিছু নিদর্শন পেয়েছিলেন,—সাময়িক জীবনের ঘটনায় তা ছিল না। তাই সামাজিক উপন্যাসে বঙ্কিমচন্দ্র কিছু নৈতিক আদর্শ প্রচার করেছিলেন—কিন্তু তাতে দেশোচ্ছ্বাসের প্রসঙ্গ ছিল না। কিন্তু ইংরেজের বিরুদ্ধে যে অসন্তোষ ধীরে ধীরে ধূমায়িত হচ্ছিল,—কাব্য-নাটকে-সংবাদপত্রে-আন্দোলনে তারই বিস্ফোরণ। বঙ্কিমচন্দ্র ইতিপূর্বে 'কমলাকান্তের দপ্তরে' তাঁর দেশপ্রীতি প্রচার করেছেন, কাজেই উপন্যাসে সামাজিক কাহিনী অবলম্বন করলেও দেশচর্চার ধারাবাহিকতা তাতে ক্ষুণ্ণ হয়নি। জাতির সার্বিক মঙ্গলকামনা বঙ্কিমচরিত্রের প্রধান অবলম্বন। কোথাও তা একেবারে থেমে থাকেনি।

'রাজসিংহ' উপন্যাসটি বঙ্কিমচন্দ্রের বিশেষ চিন্তার ফল। 'বঙ্গদর্শনে'-এ উপন্যাস ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়, —প্রথম সংস্করণের ৮০ পৃষ্ঠার গ্রন্থটি চতুর্থ সংস্করণে ৪৩৪ পৃষ্ঠায় পরিবর্ধিত হয়েছিল বলেই নয়,—বঙ্কিমচন্দ্র একটি পূর্ণাঙ্গ ঐতিহাসিক উপন্যাস লেখার জন্যই এ পরিশ্রম করেছিলেন। চতুর্থ সংস্করণে বঙ্কিমচন্দ্র খুব স্পষ্টভাবে তাঁর উদ্দেশ্য ব্যক্ত করেছিলেন,—

'ভারতকলঙ্ক' নামক প্রবন্ধে আমি বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছি, ভারতবর্ষের অধঃপতনের কারণ কি কি। হিন্দুদিগের বাহুবলের অভাব সে সকল কারণের মধ্যে নহে।

এই উনবিংশ শতাব্দীতে হিন্দুদিগের বাহুবলের কোন চিহ্ন দেখা যায় না। ইংরেজ সাম্রাজ্যে হিন্দুর বাহুবল লুপ্ত হইয়াছে। কিন্তু তাহার পূর্বে কখনও লুপ্ত হয় নাই। হিন্দুদিগের বাহুবলই আমার প্রতিপাদ্য।' [ভূমিকা, চতুর্থ সংস্করণ]

বাহুবলের একটি ঐতিহাসিক দৃষ্টান্ত প্রচারের জন্য বঙ্কিমচন্দ্রের এই আগ্রহের কারণটি লক্ষ্যণীয়। ১৮৮২ খ্রীষ্টাব্দে 'রাজসিংহের' প্রথম সংস্করণ প্রকাশের কালে দেশপ্রেম নিছক ভাববিলাস মাত্র ছিল না। তখন রাজনৈতিক দল গঠিত হয়েছে, কংগ্রেসেরও জন্ম হয়েছে, হিন্দুমেলায় স্বাদেশিকতার বিভিন্ন দিক আলোচিত হয়েছে। বিদেশীর হাত থেকে মুক্তি পাওয়ার একটা বাসনা প্রচ্ছন্নভাবে জনচিত্তে জেগে উঠেছিল কিন্তু কি উপায়ে সেটা সম্ভব হবে—তা জানা ছিল না। দেশপ্রেমিক বঙ্কিমচন্দ্র এই পর্বেই তাঁর বিখ্যাত স্বদেশপ্রেমের উপন্যাস রচনা করেছিলেন ;— 'আনন্দমঠের' রচনাকালও ১৮৮২ সালেই। 'রাজসিংহে' বাহুবলের নজির স্থাপনের জন্য বঙ্কিমচন্দ্র একটি দৃঢ় ঐতিহাসিক ভিত্তি অবলম্বন করেছিলেন কেন তাও বিশেষ-ভাবে আলোচনাযোগ্য। তাঁর আগের যে সব উপন্যাসে আমরা স্বদেশপ্রীতির দৃষ্টান্ত পেয়েছি—তা ইতিহাস-সম্পৃক্ত কাল্পনিক কাহিনী। কাল্পনিক চরিত্রের চেয়ে একটি সজীব ঐতিহাসিক ব্যক্তিত্বের আদর্শ যে অনেক বেশী আবেদন সৃষ্টি করবে, এ বিশ্বাস নিয়েই ঐতিহাসিক চরিত্র রচনায় বঙ্কিমচন্দ্র আগ্রহ প্রকাশ করেছিলেন। বাহুবল ও মনোবল নিয়ে রাজসিংহ মোগলসম্রাট ঔরঙ্গজেবের বিরুদ্ধে যে অভিযান চালিয়েছিলেন তার ইতিহাসানুগ বিবরণ দেবার উদ্দেশ্যেই উপন্যাসটি রচিত। তবুও রাজসিংহ যে প্রথমতঃ উপন্যাস সেকথাও স্মরণ রাখতে হবে।

"যখন বাহুবল মাত্র আমার প্রতিপাদ্য, তখন উপন্যাসের আশ্রয় লওয়া যাইতে পারে।···বিশেষতঃ উপন্যাসের ঔপন্যাসিকতা রক্ষা করিবার জন্য কল্পনাপ্রসূত অনেক বিষয়ই গ্রন্থ মধ্যে সন্নিবেশিত করিতে হইয়াছে।" [ভূমিকা, চতুর্থ সংস্করণ]

রাজসিংহের ইতিহাস আমরা জানি না, একটি সচেতন জাতির এই অপরাধ বঙ্কিমচন্দ্র ক্ষমা করেননি, নির্মমভাবে সমালোচনা করেছেন। ইংরেজের রাজত্বে আমাদের বাহুবলই বিনষ্ট হয়নি আমাদের দেশানুরাগও বিনষ্ট হয়েছে। ইতিহাস অচেতনতাকে বঙ্কিমচন্দ্র অমার্জনীয় অপরাধ বলে মনে করতেন। রাজসিংহের কাহিনী বর্ণনায় বঙ্কিমচন্দ্রের ক্ষুব্ধচিত্তের পরিচয় পাই আমরা। "আমরা গ্রীক ইতিহাস মুখস্থ করিয়া মরি—রাজসিংহের ইতিহাসের কিছুই জানি না। আধুনিক শিক্ষার সুফল।" [পঞ্চম খণ্ড, ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ]

আমাদের ইতিহাস চেতনাকে জাগাবার এই চেষ্টা 'রাজসিংহে' নতুন নয়, বঙ্কিমচন্দ্রের অন্যান্য উপন্যাসেও সে চেষ্টা বারংবার দেখেছি। শি[illegible]। বঙ্কিমচন্দ্র

নবজাগরণে উদ্বুদ্ধ জাতিকে একটি দৃঢ় ভিত্তির ওপরে প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিলেন,—ইতিহাস এই মুহূর্তে যা শেখাতে পারে অন্যকিছুর দ্বারা তা পাওয়া সম্ভব নয়।

'রাজসিংহে' ইতিহাসের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপনের বাসনাটি দেশপ্রেমিক বঙ্কিমচন্দ্রের গভীর দেশচিন্তার ফল। বাঙ্গালীর ইতিহাসে যে বস্তুটি বহু আয়াসে তিনি আবিষ্কার ও প্রমাণ করার চেষ্টা করেছিলেন রাজস্থানের ইতিহাসের সর্বত্র তা ছড়িয়ে আছে। প্রতাপসিংহ, সংগ্রামসিংহ, বাপ্পারাও, পুত্তের বীরত্ব কাহিনী, আত্মদানের ভিত্তি দেশপ্রেমের ওপরেই প্রতিষ্ঠিত। এই ঐতিহ্য উত্তরাধিকারসূত্রে লাভ করেছিলেন রাজসিংহ। কাজেই মোঘলশক্তিকে প্রতিহত করার জন্য প্রাণপণ সংগ্রামের শক্তি-প্রদর্শন করে বিজয়ী হয়েছিলেন রাজসিংহ। রাজ্যরক্ষা বা সিংহাসন রক্ষার স্বার্থ ত আছেই কিন্তু তার মধ্যেও যখন অসীম বীরত্ব ও শৌর্যের প্রকাশ দেখি তখন তার দ্বারা অনুপ্রাণিত হতে চাই। দেশপ্রীতিও যে এক জাতীয় স্বার্থবোধ প্রণোদিত চিন্তা এও স্বীকৃত সত্য। রাজস্থানের ইতিহাসে প্রতাপসিংহ স্বদেশপ্রেমের মূর্ত প্রতীক—রাজসিংহকেও সেই আদর্শে অঙ্কন করেছেন বঙ্কিমচন্দ্র। রাজস্থানের ইতিহাস শিক্ষিত বাঙ্গালীর দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলো বহু পূর্বেই। বঙ্কিমচন্দ্র কিন্তু ভূমিকায় বলেছেন,

"মোঘলের প্রতিদ্বন্দ্বী হিন্দুদিগের মধ্যে প্রধান রাজপুত ও মহারাষ্ট্রীয়। মহারাষ্ট্রীয়দিগের কথা সকলেই জানে, রাজপুতগণের বীর্য অধিকতর হইলেও, এদেশে তেমন সুপরিচিত নহে।"

'রাজসিংহ' রচিত হওয়ার বহু আগে রঙ্গলাল, মধুসূদন, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ প্রমুখ শক্তিমান সাহিত্যিকেরা রাজস্থানের ইতিহাস অবলম্বনে কাব্য-নাটক রচনা করে স্বদেশপ্রেমের দৃষ্টান্ত তুলে ধরার চেষ্টা করেছিলেন। কাজেই ১৮৯৩ খ্রীঃ চতুর্থ সংস্করণের ভূমিকায় বঙ্কিমচন্দ্রের এই উক্তিটি খুব সত্য বলে মনে হয় না। বিশেষতঃ রমেশচন্দ্রের 'রাজপুত জীবনসন্ধ্যা' রচিত হওয়ার পরে নতুন করে রাজস্থানের কাহিনী পরিবেশনের কোন যুক্তি নেই। কাজেই বঙ্কিমচন্দ্র বাহুবলের দৃষ্টান্ত স্থাপনের উদ্দেশ্যেই যে রাজসিংহ চরিত্রটি বেছে নিয়েছিলেন তাতে কোন সন্দেহ নেই। রাজসিংহ বীর ও স্বদেশপ্রেমিক, রাজপুতের ঐতিহ্যরক্ষার চেয়ে বড়ো ধর্ম তার কাছে নেই,—তাই অবিচলচিত্তে তিনি দেশরক্ষার কাজে আত্মনিয়োগ করেছেন। চঞ্চলকুমারীর মত অসাধারণ একটি নারী যখন আত্মনিবেদনে উন্মুখ—রাজসিংহ তখনও আপন কর্তব্যে অবিচল। চঞ্চলকুমারী যোগ্যব্যক্তির কাছেই আশ্রয় প্রার্থনা করেছিলেন। অনবদ্য ভঙ্গিমায় রাজসিংহকে অতীত ঐতিহ্য স্মরণ করিয়ে দিয়ে পত্র রচনা করেছিলেন চঞ্চলকুমারী,—

"দিল্লীশ্বরের সহিত বিবাদ সহজ নহে জানি। এ পৃথিবীতে আর কেহই নাই যে,

তাহার সঙ্গে বিবাদ করিয়া তিষ্ঠিতে পারে। কিন্তু মহারাজ! মনে করিয়া দেখুন, মহারানা সংগ্রামসিংহ বাবরশাহকে প্রায় রাজ্যচ্যুত করিয়াছিলেন। মহারাণা প্রতাপসিংহ আকবর শাহকেও মধ্যদেশ হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিয়াছিলেন। আপনি সেই সিংহাসনে আসীন—আপনি সেই সংগ্রামের, সেই প্রতাপের বংশধর—আপনি কি তাঁহাদিগের অপেক্ষা হীনবল? [৩য় খণ্ড, ৫ম পরিচ্ছেদ]

এ অংশটিতে বঙ্কিমচন্দ্রেরই কণ্ঠস্বর চঞ্চলকুমারীর মুখে শোনা যাচ্ছে যেন। ইতিহাস স্মরণ করিয়ে দিতে হলে এ জাতীয় দৃপ্তভাষার সাহায্যই নেওয়া দরকার। বঙ্কিমচন্দ্র যদি ঠিক এই কথাগুলি সমগ্র জাতির উদ্দেশ্যে নিবেদন করতেন তাহলে ভাষাগত পরিবর্তন কিছু হোত না। এ জাতীয় উৎসাহ উদ্দীপনার বাণী শক্তিসঞ্চয়ে ইচ্ছুক জনতার কানে খুব অর্থবহ বলে মনে হওয়াটাই স্বাভাবিক। যুদ্ধযাত্রার পূর্বাহ্নে জাতীয়চেতনার দ্বারা উদ্দীপিত হওয়ার মুহূর্তেই রাজসিংহের হাতে চঞ্চলকুমারীর এই পত্রটি পৌঁছেছিল।

উপন্যাস রচনার মুহূর্তেও বঙ্কিমচন্দ্র আত্মবিস্মৃত হন না,—তাই উপন্যাসে তিনিও একটি চরিত্র হয়ে ওঠেন। সেটা উপন্যাসের পক্ষে কতখানি বেমানান—সে আলোচনায় নতুন করে প্রবেশের প্রয়োজন নেই। অন্যান্য সব উপন্যাসের মত 'রাজসিংহ' উপন্যাসেও বঙ্কিমচন্দ্র শিল্পীর নীরবতা পালনে অক্ষম হয়েছেন। তাই রাজসিংহের সপ্তম খণ্ডের প্রথম পরিচ্ছেদটি পাঠ করলে আমাদের একথা মনে হওয়া স্বাভাবিক যে বঙ্কিমচন্দ্র এ উপন্যাসে ঐতিহাসিক যুদ্ধ বিষয়ে একটি ক্ষুদ্র প্রবন্ধ রচনারই চেষ্টা করেছেন। রাজসিংহের কৃতিত্বকে বৃহৎ ও মহৎ করে প্রমাণ করার জন্যই এ অংশটি প্রাবন্ধিক বঙ্কিমচন্দ্রের কলম থেকেই বেরিয়েছে। নতুবা যুদ্ধদৃশ্যে এমন কোন বিশ্বাসযোগ্য বর্ণনা নেই—যার সাহায্যে রাজসিংহকে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ যোদ্ধাদের সঙ্গে এক করে ফেলা সম্ভব। ফলে প্রমাণের জন্য বঙ্কিমচন্দ্রকেই আসরে অবতীর্ণ হতে হল। ইতিহাসের ঘটনাকে উপন্যাসের আধারে স্থাপন করেও বঙ্কিমচন্দ্র রাজসিংহের সত্যিকারের বাহুবলের পরিচয় দিতে পেরেছেন কি না সন্দেহ। অথচ বাহুবলের প্রতিষ্ঠা করাই' স্বদেশপ্রেমিক বঙ্কিমচন্দ্রের একান্ত বাসনা ছিল, বর্ণনাদোষেই সেটি প্রস্ফুটিত হয়নি।

'রাজসিংহ' উপন্যাসের শেষে বঙ্কিমচন্দ্র স্বয়ং আবেদন নিয়ে উপস্থিত হয়েছেন। রাজসিংহকে বড়ো করে দেখানোর পেছনে সচেতন ভাবে মোঘলবিদ্বেষ থাকতে পারে না। বঙ্কিমচন্দ্র হিন্দুর বীরত্বচিত্র অঙ্কন করেছেন বটে—তাঁর উদ্দেশ্য ছিল মহৎ আদর্শ ও সুনিপুণ যোদ্ধার পক্ষে সৈন্যবলই যে একমাত্র বল নয়,—এই সত্যটিই প্রমাণ করা। তাছাড়া ইতিহাসের বর্ণনায় অযথা হস্তক্ষেপ অন্ততঃ এ উপন্যাসে নেই।

বঙ্কিমচন্দ্র এ প্রসঙ্গে বলেছেন,

অন্যান্য গুণের সহিত যাহার ধর্ম আছে—হিন্দু হৌক, মুসলমান হৌক, সেই শ্রেষ্ঠ। অন্যান্য গুণ থাকিতেও যাহার ধর্ম নাই—হিন্দু হৌক, মুসলমান হৌক—সেই নিকৃষ্ট। [উপসংহার]

রাজসিংহের ধর্ম ছিল দেশরক্ষার ধর্ম, এই শক্তিতেই অসম্ভব ঘটনাও সম্ভব হয়েছিল। বঙ্কিমচন্দ্র পরিশেষে আবার দুঃখ জানিয়েছেন,—

"...ওলন্দাজ উইলিয়ম ও রাজপুত রাজসিংহ বিশেষ প্রকারে তুলনীয়। উভয়ের কীর্তি ইতিহাসে অতুল। উইলিয়ম ইউরোপে দেশহিতৈষী ধর্মাত্মা বীরপুরুষের অগ্রগণ্য বলিয়া খ্যাতিলাভ করিয়াছিলেন, এদেশে ইতিহাস নাই, কাজেই রাজসিংহকে কেহ চেনে না।" [উপসংহার]

এ খেদটি স্বদেশপ্রেমিক বঙ্কিমচন্দ্রের। রাজস্থানের ইতিহাসে রাজসিংহের মধ্যেই বঙ্কিমচন্দ্র দেশপ্রেমের অপূর্ব বিকাশ লক্ষ্য করেছিলেন। এ প্রসঙ্গে কোন সমালোচক বলেছেন,—

"অন্যান্য উচ্চাঙ্গের লেখকের মত বঙ্কিমচন্দ্র প্রথমে মানুষের প্রতি ভালবাসার উচ্চ আদর্শ দেখাইয়া—ভালবাসার বিস্তার দেখাইয়াছেন। যে ভালবাসা প্রথমে মানুষে নিবদ্ধ থাকে, তাহা ক্রমে দেশপ্রেমে ও জাতিপ্রেমে পরিণতি পাইয়াছিল। রাজসিংহে দেশপ্রেমের উচ্চ আদর্শ; আনন্দমঠে স্বজাতিপ্রেমের বিকাশ।"[১৭]

বঙ্কিমচন্দ্রের 'আনন্দমঠ', 'রাজসিংহের' অনতিকাল পরেই রচিত ও প্রকাশিত হয়েছিল। বাংলাসাহিত্যে 'আনন্দমঠ' ও 'আনন্দমঠের' রচয়িতা বঙ্কিমচন্দ্রের স্থান নির্ণয় করার কোনো অসুবিধে নেই। বাঙ্গালী বঙ্কিমচন্দ্রকে সম্রাটের আসনে বসিয়েছে এবং দেশপ্রেমিক বলে সম্বর্ধনা জানিয়েছেন এই গ্রন্থটির জন্যই। 'আনন্দমঠ' সেযুগের বিপ্লবীদের আত্মদানের প্রেরণা জুগিয়েছে। সমগ্র দেশের সংগ্রামী জনতা আনন্দমঠের আদর্শে ভবিষ্যৎ নির্ধারণ করেছে।

দেশপ্রেমিক বঙ্কিমচন্দ্রের যাবতীয় দেশাত্মবোধক রচনার সঙ্গে 'আনন্দমঠের' মূল পার্থক্য রয়েছে। অন্যান্য রচনায় দেশপ্রেম কখনও ইতিহাসপ্রীতি কিংবা বীরত্বের স্মৃতির চর্চাতেই নিবদ্ধ—'আনন্দমঠেই' বঙ্কিমচন্দ্র সে যুগের উপযুক্ত একটি সশস্ত্র বিপ্লবের অভ্যুত্থানের পরিকল্পনা করেছিলেন আশ্চর্য দক্ষতার সঙ্গে। দেশপ্রেমিকতা একটা চূড়ান্ত রূপ নিয়েছে এই রচনায়। সে যুগের যে কোন স্রষ্টাই সাহিত্যের মাধ্যমে দেশচিন্তা প্রকাশ করেছেন খানিকটা বাধ্য হয়েই। প্রমথনাথ বিশী বলেছিলেন,

---

১৭. হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ, বঙ্কিমচন্দ্র, ১৯৬২, পৃঃ ৪২।

"স্বাদেশিকতার এই বিড়ম্বনা বৃটিশ আমলের বাংলা সাহিত্যের একটি প্রধান ত্রুটি—এবং এই ত্রুটির জন্যই [আরও ত্রুটি আছে] বাংলা সাহিত্য সম্পূর্ণ সুস্থ হইতে পারে নাই।"[১৮]

কিন্তু অক্ষম লেখকের গতানুগতিক রচনায় দেশপ্রেমিকতা সুলভ হয়েছে বলে সাহিত্যের স্বাস্থ্যহীনতার অভিযোগ আনাটা কিছুমাত্র বিচিত্র নয়। কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্রকে অক্ষম লেখকের সঙ্গে এ ব্যাপারে এক করে ফেলা যায় না। স্বদেশপ্রেম রচনার মূল উপাদান হলেও বঙ্কিমচন্দ্রের নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গীর অনন্যতায় তা সমৃদ্ধ। তাঁর অন্যান্য রচনায় স্বদেশপ্রেমের প্রতিফলন কোথাও প্রচ্ছন্ন, কোথাও প্রকাশ্য—কিন্তু 'আনন্দমঠে' পুরোপুরি স্বদেশপ্রেমের প্রসঙ্গ তুলে ধরা হয়েছে। প্রশ্ন উঠতে পারে স্বদেশপ্রেমের তত্ত্ব পরিবেশনের জন্য উপন্যাস রচনার প্রয়োজন কোথায়? বঙ্কিমচন্দ্রই প্রমাণ করেছেন, যে কোন দুরূহ তত্ত্বই উপন্যাসে স্থান পেতে পারে এবং উপন্যাসের সৌন্দর্য তাতেও বজায় রাখা যায়। তাঁর শেষ জীবনের তিনটি উপন্যাস একথা প্রমাণ করবে।

'আনন্দমঠের' স্বদেশপ্রেমের ব্যাখ্যায় বঙ্কিমচন্দ্র নিছক উপদেশমূলকতার আশ্রয় নেননি। কতকগুলো কল্পিত চরিত্র সৃজন করে একটি আদর্শলোক সৃষ্টি করেছেন; তাঁরা কেউই এ জগতের নন,—এ পৃথিবীতে তাঁদের অস্তিত্ব অতীতেও ছিল না—ভবিষ্যতেও থাকবে না। একটি নিছক কল্পলোক স্থাপন করে বঙ্কিমচন্দ্র স্বদেশ-প্রেমের তত্ত্ব বিশ্লেষণ করলেন অথচ সে প্রশ্নটি সে যুগের রক্তমাংসের মানুষগুলোকে এমন করে আলোড়িত করল কেন, সেটাই আশ্চর্য। 'আনন্দমঠের' অবাস্তবতার সমালোচনা হয়েছে বটে কিন্তু এই অবাস্তবতা বাস্তব চরিত্রকে প্রভাবিত করেছিল কেন সে প্রসঙ্গ চাপা পড়ে আছে। বঙ্কিমচন্দ্র যে যুগে ঐ উপন্যাসের পরিকল্পনা করেছিলেন সেযুগের মানুষরা অতীতের ঐতিহ্য আবিষ্কার করে উত্তেজিত, ভবিষ্যতের স্বপ্নে উন্মাদ হয়েছিলেন। উনবিংশ শতাব্দীর শেষপাদে শিক্ষিত বাঙ্গালীর ধ্যান-ধারণার কোনটাই কি খুব বেশী বাস্তব? রবীন্দ্রনাথের 'জীবনস্মৃতিতে' স্বাদেশিকতার যে বর্ণনা পাই তাতে বাস্তবতা ছাড়া অন্য সবকিছুই দেখতে পাই। রবীন্দ্রনাথ ও জ্যোতিদাদার মত নিতান্ত বালকদের কীর্তিকাহিনী হলেও একে বালকসুলভ ছেলেমানুষী বলে মনে করা যেতো। কিন্তু সে যুগের বিখ্যাত মনীষী বৃদ্ধ রাজনারায়ণ বসুকেই যখন সে সভায় নেতৃত্ব করতে দেখা যায় তখন আর বুঝতে অসুবিধে হয় না যে সেই যুগটাই ছিল একটা অস্বাভাবিকতার যুগ। রক্তমাংসের মানুষরা তাদের বাস্তব বুদ্ধি হারিয়ে ফেলেছিলেন বলেই হাতে তৈরী গামছার টুকরো মাথায় বেঁধে

১৮. প্রমথনাথ বিশী, বঙ্কিম সাহিত্যের ভূমিকা, কমলাকান্তের দপ্তর।

স্বদেশপ্রেমিক ব্রজবাবুর তাণ্ডব নৃত্যের চিত্র 'জীবনস্মৃতির' মত একটি জীবনচরিতে স্থান পেয়েছিল। এর সত্যতায় কোন সন্দেহ থাকতে পারে না। 'জীবনস্মৃতিতে' রবীন্দ্রনাথ যে সময়ের ঘটনার কথা লিখেছেন 'আনন্দমঠের' রচনাকাল থেকে সে সময় খুব বেশী দূরে নয়। প্রায় কাছাকাছি সময়ের মানুষের জীবনচরিতের এসব ঘটনার আলোকে মোটামুটি সে যুগের আবহাওয়ার একটা ছবি পাওয়া যেতে পারে। 'আনন্দমঠে' বঙ্কিমচন্দ্র সে যুগের প্রাণস্পন্দনটুকু ধরতে পেরেছিলেন বলেই সে যুগের মানুষরা এ উপন্যাসে অবাস্তবতা দেখেনি,—অনুপ্রাণিত হয়েছে। পরের যুগে 'আনন্দমঠের' সঙ্গীত আবৃত্তি করতে করতে ফাঁসীমঞ্চে আরোহণ করতে দ্বিধাবোধ করেনি শহীদেরা।

তবে 'আনন্দমঠে' বঙ্কিমচন্দ্র যে যুগের কাহিনী বলতে চেয়েছিলেন সে পটভূমিকা থেকে দেখলে বহু অসঙ্গতি আমাদের পীড়িত করবে। সত্যানন্দ, জীবানন্দ, ভবানন্দ, মহেন্দ্র, শান্তিকে অতীতে স্থাপন করেই বিষয়টিকে অসম্ভাবিত একটি পরিবেশে টেনে আনা হয়েছে। সমালোচকদের অভিযোগ এ ব্যাপারেই। বঙ্কিমচন্দ্র অতীতের পটভূমিকায় বর্তমানের কল্পনাকে স্থাপন করেছিলেন বলেই বিষয়টি জটিলতা সৃষ্টি করেছে। ঊনবিংশ শতাব্দীতে যে পরিবেশ গড়ে উঠেছিল তাতেই সত্যানন্দের মত নেতা, মহেন্দ্রের মতো গৃহী, শান্তির মতো অসমসাহসিকার আবির্ভাব সম্ভব ছিল,—এবং স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাস আলোচনা করলেও এ জাতীয় বাস্তব চরিত্রের দেখা মিলবে। স্বাধীনতা আন্দোলনের ঠিক পূর্বাহ্নে বঙ্কিমচন্দ্রের এই উদ্দেশ্য-প্রণোদিত রচনাটির সমালোচনার মাপকাঠি একটু পৃথক হওয়া দরকার। এ উপন্যাস যুগেরই সৃষ্টি,—যুগন্ধরের কল্পনাতেই এ উপন্যাস জন্ম নেওয়া সম্ভব।

শাসক ইংরেজের সঙ্গে আমাদের সম্পর্কটি সে যুগেই সঠিকভাবে নির্ণীত হয়েছিল। যুক্তির আলোকে স্বাধীনতা ও পরাধীনতার পার্থক্য স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল, যা ইতিপূর্বে কখনও হয়নি। হয়নি বলেই পরাধীনতার মর্মজ্বালায় অতীতের কোনো মানুষকেই আমরা এমন ভাবে পীড়িত হতে দেখিনি। কিম্বা পরাধীনতার হাত থেকে আত্মরক্ষা করার জন্য সম্মিলিত আন্দোলনের কোনো প্রয়োজনও এদেশে ইতিপূর্বে কখনও হয়নি। বঙ্কিমচন্দ্র সেই আন্দোলনের মাঝখানেই এসে পড়েছিলেন,—হেমচন্দ্র সেই বেদনার কথাই কবিতায় আক্ষেপ করে গেছেন। দেশচেতনা জাগিয়ে তোলার ঠিক পরেই সংঘবদ্ধ আন্দোলন সম্ভব হল,—সেই মুহূর্তেই বঙ্কিমচন্দ্র সংঘবদ্ধতার শক্তি, দেশপ্রেমের সার্থকতার চিত্র তুলে ধরলেন। যে যুগে সমস্ত ভারতবাসী দেশের স্বাধীনতালাভের আকাঙ্ক্ষায় জীবন পণ করেছে—তার ঠিক আগেই তত্ত্বের প্রলেপ লাগিয়ে বঙ্কিমচন্দ্র একটি অর্থপূর্ণ দেশপ্রেমমূলক ইতিবৃত্ত রচনা করেছেন। ভবিষ্যৎদ্রষ্টা

শিল্পী অনাগতকে চিনে নিতে পারেন,—চেনাতে পারেন। কিন্তু আত্মসচেতন শিল্পী আত্মরক্ষার বর্ম পরিধান করেই আসরে অবতীর্ণ হন। হেমচন্দ্রকে স্বদেশপ্রেমের মূল্য দিতে হয়েছিল,—বঙ্কিমচন্দ্র সরকারী চাকরী করেও নির্বিবাদে 'আনন্দমঠ' রচনা করলেন। একটু ঘুরপথে চলেছিলেন বলেই অকারণ উৎপাতে বিরক্ত হতে হয়নি তাঁকে। শুধু তাই নয়, সরকারী চাকরী করতেন বলেই শেষ পর্যন্ত রাজপ্রশংসা করেই ইতি টানতে হয়েছে তাঁকে। ইংরেজ প্রশংসা চন্দ্রশেখরেও দেখেছি, প্রশংসনীয় বা গ্রহণীয় গুণকে উদারভাবে গ্রহণ করার শক্তিও থাকে অসাধারণদেরই। উনবিংশ শতাব্দীর শিক্ষিত সম্প্রদায় সবরকম সংস্কার ত্যাগ করতেই প্রস্তুত ছিলেন, অন্ধতা থেকে মুক্ত না হলে সত্যিকারের সিদ্ধি আসতে পারে না। বঙ্কিমচন্দ্র সে সত্য সমর্থন করতেন।

'আনন্দমঠের' স্বদেশপ্রসঙ্গ আলোচনার পূর্বে বঙ্কিমচন্দ্রের দেশপ্রেমিকতা সম্বন্ধে আরও কয়েকটি কথা স্পষ্ট করা দরকার। জাতীয়তাবাদ ও দেশপ্রেম সম্বন্ধে বঙ্কিমচন্দ্র খুব স্পষ্টভাবেই প্রবন্ধে আলোচনা করেছিলেন,

"আত্মরক্ষার ন্যায় ও স্বজনরক্ষার ন্যায় স্বদেশরক্ষা ঈশ্বরোদ্দিষ্ট কর্ম, কেন না, ইহা সমস্ত জগতের হিতের উপায়। পরস্পরের আক্রমণে সমস্ত বিনষ্ট বা অধঃপতিত হইয়া কোন পরস্বলোলুপ পাপিষ্ঠ জাতির অধিকারভুক্ত হইলে, পৃথিবী হইতে ধর্ম ও উন্নতি বিলুপ্ত হইবে। এই জন্য সর্বভূতের হিতের জন্য সকলেরই স্বদেশরক্ষণ কর্তব্য।"

[স্বদেশপ্রীতি]

এই ধারণালব্ধ দেশপ্রীতিকে ধর্মচেতনার সঙ্গে যুক্ত করে বঙ্কিমচন্দ্র পাশ্চাত্য দেশপ্রীতির সঙ্গে ভারতীয় দেশপ্রীতির একটা ভেদরেখা নির্ণয় করেছেন। দেশপ্রীতি যদি সর্বভূতের হিতের জন্য নিয়োজিত না হয় তবে তার মূল্য বঙ্কিমচন্দ্র স্বীকার করেননি। বিশ্বপ্রীতির ব্যাপক অর্থ বঙ্কিমচন্দ্রের স্বদেশপ্রীতির মধ্যে রয়েছে। ইউরোপীয় দেশপ্রেম সংকুচিত, সর্বভূতের হিতচিন্তা করার মত উদারতা সেখানে নেই। একই প্রবন্ধে সমালোচনা করেছেন তিনি,—

ইউরোপীয় patriotism ধর্মের তাৎপর্য এই যে, পরসমাজের কাড়িয়া ঘরের সমাজে আনিব। স্বদেশের শ্রীবৃদ্ধি করিব, কিন্তু অন্য সমস্ত জাতির সর্বনাশ করিয়া তাহা করিতে হইবে। [ঐ]

এই দুটি মতামত থেকে বঙ্কিমচন্দ্রের স্বদেশচর্চার স্বরূপটি স্পষ্ট হয়। পরস্বলোলুপ পাপিষ্ঠ জাতির লোভের হাত থেকে আত্মরক্ষার উপায় তিনি চিন্তা করেছিলেন। স্বদেশপ্রেমের শক্তিই এই দুরবস্থার হাত থেকে মুক্তি দিতে পারে। সংঘবদ্ধতার শক্তি না থাকলে, ধর্মচেতনা বিবর্জিত হলে যথার্থ স্বদেশপ্রেম জাগতেই পারে না, এ ছিল

স্বদেশপ্রেম সম্পর্কে বঙ্কিমচন্দ্রের সর্বশেষ ধারণা। 'আনন্দমঠে' এই ধারণারই উপন্যাস রূপ দেওয়া হয়েছে। পাশ্চাত্যদর্শন ও ধর্মতত্ত্ব আলোচনা করে বঙ্কিমচন্দ্র স্বীয় মতামতকেই শেষ পর্যন্ত প্রাধান্য দিলেন। ভারতীয় আদর্শের সঙ্গে ত্যাগের আদর্শ জড়িয়ে আছে, ধর্মের এই মূল্যবান উপদেশটিকে 'আনন্দমঠ' উপন্যাসে বিশেষভাবে ব্যবহার করা হয়েছে। দেশের দুর্দিনে পীড়িত জনগণকে রক্ষার চেয়ে বড়ো ধর্ম আর কিছু নেই,—আত্মস্বার্থ ত্যাগ না করলে আর্তরক্ষা হয় না, সুতরাং একটি সম্প্রদায়ের হাতে এ দায়িত্ব তুলে দিলেন বঙ্কিমচন্দ্র। বঙ্কিমচন্দ্র প্রাচীনভারতের মানবতার আদর্শকেই নতুন করে সঞ্জীবিত করেছিলেন,—কিন্তু সমসাময়িক আন্দোলনের পটভূমিকায় মানবতার বাণীই দেশপ্রেমিকতার সঙ্গে যুক্ত হয়ে অভিনব বস্তু হয়ে দাঁড়িয়েছিল সে যুগে। আত্মত্যাগের আদর্শ যে কোন ভিত্তিতেই প্রতিষ্ঠিত হোক না কেন, দেশপ্রেমেই তার মূল্যায়ন হোত। 'আনন্দমঠের' সন্ন্যাসীদের নিষ্কাম কর্মযোগের মধ্যে সে যুগের বাঙ্গালী যে যুগোপযোগী ভাবানুসন্ধান করেছিল—সেত সত্য কথা। অথচ 'দেবীচৌধুরাণীর' ভবানী পাঠক কিংবা 'আনন্দমঠের' সত্যানন্দের সাধনা যে মানবতারই সাধনা এ ব্যাখ্যায় খুব ভুল কিছু নেই। এ প্রসঙ্গে কোন সমালোচক বলেছেন,

"মনে হয়, ভারতের সেই প্রাচীন ধর্মতত্ত্বকেই ভিত্তি করিয়া বঙ্কিমচন্দ্র যে নবধর্ম প্রণয়ন করিয়াছিলেন—তাহার দৃঢ়তম খিলান হইল এই দেশপ্রীতি।···ভারতীয় ধর্মের অঙ্গীকৃত করিয়া এই স্বদেশপ্রীতিকে এত বড় স্থান দিবার কল্পনাও পূর্বে কেহ করে নাই।"[১৯]

'আনন্দমঠ' উপন্যাসে বঙ্কিমচন্দ্রের এই বক্তব্যই স্থান পেয়েছে কিন্তু ইতিহাসের যে অংশে তিনি তাঁর এই নবলব্ধ ও নব আবিষ্কৃত তথ্য আরোপ করেছেন তাতেই বিষয়টি জটিলতর হয়েছে। সন্ন্যাসী বিদ্রোহ সম্পর্কে পূর্বের আলোচনায় দেখানো হয়েছে যে, বাংলা দেশের ইংরেজ শাসন সুদৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার আগে যেসব আঞ্চলিক উপদ্রব হয়েছিল—সন্ন্যাসীবিদ্রোহ তার অন্যতম। দেশপ্রেমের মহান আদর্শ ও সুপরিণত চিন্তাধারা সেই লুঠেরা সন্ন্যাসীদের চরিত্রে আরোপ করার একটি মাত্র যুক্তি থাকতে পারে,—বঙ্কিমচন্দ্র দেশ-কাল-পাত্রকে নিরাপদ দূরত্ব থেকে নির্বাচন করে রাজকর্মচারী হিসেবে এই কৌশলের আশ্রয়টুকু নিয়েছিলেন। যেটুকু ক্ষীণ ইতিহাস ছিল সেটুকুও সদ্ব্যবহার করেছেন এ ব্যাপারে। শুধু 'আনন্দমঠ' নিয়েই যদি এ জাতীয় সমস্যা দেখা দিত তাহলে বঙ্কিমচন্দ্রের এ কৌশল সম্বন্ধে সন্দেহ থাকত।

১৯ মোহিতলাল মজুমদার, বাংলার নবযুগ, ১৩৫২ পৃঃ ১১০-১১১।

কিন্তু আগের ও পরের বহু উপন্যাসেই বঙ্কিমচন্দ্র এ জাতীয় কৌশল অবলম্বন করেছেন বলেই বিষয়টির যথার্থ কারণ অনুমান করার অসুবিধে হয় না। অন্যান্য উপন্যাসে স্বদেশপ্রেমের ব্যাখ্যাই মুখ্য কথা নয়, সুতরাং ইতিহাসের সামান্য দেহে কল্পনার কাদামাটি লেপন করার ফলে অনবদ্য দেবী প্রতিমা নির্মিত হয়েছে। কিন্তু উনবিংশ শতাব্দীর গবেষণার ফলাফল অতীত বাংলার পটভূমিকায় স্থাপন করে বঙ্কিমচন্দ্র যে সচেতন ভাবেই কালানৌচিত্য দোষ ঘটিয়েছিলেন সেকথা স্বীকার্য। উনবিংশ শতাব্দীর পরম আকাঙ্ক্ষিত স্বদেশচর্চার প্রসঙ্গটিই তিনি পরিবেশন করেছিলেন—কিন্তু কিছুটা ঐতিহাসিক সংযোগ থাকলে তার মূল্য বাড়বে এ ধারণাও ছিল বলে মনে হয়। অতীত বাংলার অরাজকতার মুহূর্তে শক্তিমান গৃহত্যাগী একদল সন্ন্যাসী যে উদ্দেশ্যেই হোক না কেন প্রতিপক্ষ ইংরেজকে বিপর্যস্ত করেছিল—এটাই বঙ্কিমচন্দ্রকে উৎসাহিত করে। তাছাড়া সবই আদর্শবাদী বঙ্কিমচন্দ্রের কল্পনার মহত্তম আবিষ্কার। এতে ইতিহাসের সন্ন্যাসীদের মর্যাদা বিন্দুমাত্র বাড়েনি কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্রের অভিনব রচনাকৌশলের প্রশংসনীয় দিকটি উজ্জ্বল হয়েছে। ইতিহাসের সন্ন্যাসীদের চিনতে হলে ইতিহাসের দ্বারস্থ হওয়াই বাঞ্ছনীয়, উপন্যাস বঙ্কিমচন্দ্রের প্রতিভার অমূল্যদান—'আনন্দমঠের' সন্তানসম্প্রদায় বঙ্কিমচন্দ্রের মানসনায়ক। কোন সমালোচক বলেছেন,—

"বঙ্কিমচন্দ্রের কল্পনা অলীক নয়। বঙ্কিমচন্দ্র অনৈতিহাসিক যে ভাববস্তুটি এদের ওপর আরোপ করেছেন তা উনবিংশ শতাব্দীর পরম আকাঙ্ক্ষিত বস্তু। দ্বিতীয়তঃ তিনি যে অতীতের প্রেক্ষাপটে দেশপ্রেমের উচ্চাদর্শ স্থাপন করেছেন তার সঙ্গত কারণ আছে। বঙ্কিমচন্দ্র যে কালটিকে উপন্যাসের জন্য নির্বাচন করেছিলেন সেই কাল ছিল অরাজকতার। এই অরাজকতাই বিদ্রোহের জন্ম দেয়।"[২০]

কাজেই বঙ্কিমচন্দ্র উপন্যাসে যে বক্তব্য পরিবেশন করেছিলেন—তাকে বর্তমানের পটভূমিকায় স্থাপন করার সুবিধে ছিল না বলেই—অতীতের অনুরূপ একটি পরিবেশ অনুসন্ধান করেছিলেন। পরিকল্পনাগত কিছু ত্রুটি থাকা সত্ত্বেও 'আনন্দমঠ' বঙ্কিমচন্দ্রের সার্থক গবেষণার উপযুক্ত ফলাফল বলেই গণ্য হবে।

"আনন্দমঠের' সন্তান সম্প্রদায়ের ব্যক্তি পরিচয় নেই—যেমন আত্মোৎসর্গকারী শহীদের ব্যক্তিপরিচয় তুচ্ছ হয়ে যায়। মহৎ কাজে যাঁরা আত্মনিবিষ্ট, তুচ্ছ সামাজিক পরিচয় সেখানে বড়ো কথা নয়। এই ভাবে সংগঠন গড়ে তোলার নির্দেশ দিয়েছিলেন লেখক। সামাজিক পরিচয় হারিয়েও যাদের মনে দুঃখ নেই—ব্যক্তিস্বার্থ হারিয়েও

২০. বিজিতকুমার দত্ত, বাংলা সাহিত্যে ঐতিহাসিক উপন্যাস, বঙ্কিমচন্দ্র ১৯৬৩।

যাঁরা আনন্দময়, 'আনন্দমঠের' চরিত্র তারাই। আনন্দমঠ, নামটির তাৎপর্যও বোধহয় এখানেই। পরের জন্য নিজের জীবনদান করার নজিরকেই আমরা সবচেয়ে বড়ো দান বলে মেনে এসেছি। বঙ্কিমচন্দ্র সাময়িক আবেগে জীবনদানের মধ্যেও মহিমা দেখতে পাননি। "জীবন তুচ্ছ, সকলেই ত্যাগ করিতে পারে।"—দেশের জন্য জীবনদানের চেয়েও বড়ো কথা নিষ্ঠার সঙ্গে দেশব্রত পালন করা। যে কোন মুহূর্তেই আদর্শ ভ্রষ্ট হওয়ার সম্ভাবনা যেখানে বর্তমান বঙ্কিমচন্দ্র সেখানে আরও কঠিন ব্রত গ্রহণের কথাই বলতে চেয়েছেন। উপক্রমণিকায় যে 'ভক্তির' কথা বলেছেন বঙ্কিমচন্দ্র, তা 'দেশভক্তি' ছাড়া অন্য কিছু হতে পারে না। দেশপ্রেমের আবেগে জীবন তুচ্ছ মনে করে যারা এগিয়ে আসবে তাদের মনোবল যেন অটুট থাকে,—এই কামনা ছিল বলেই ভক্তিমান ও নিষ্ঠাবান, আদর্শপরায়ণ ও নির্ভীক দেশপ্রেমিকের অনুসন্ধান করেছিলেন সত্যানন্দ। বঙ্কিমচন্দ্র ধর্মের ভিত্তির ওপরেই দেশপ্রেম প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিলেন—তাই সন্তানসেনার মুখে ধর্মসঙ্গীত, সন্তানসেনার উপাস্য মূর্তি সাকার দেশমাতৃকা। আত্মদানের সাময়িকবিলাস কিংবা হঠাৎ উচ্ছ্বাসকে সমর্থন করেননি তিনি। জীবনব্যাপী সাধনায় ধীরে ধীরে দেশপ্রেমিক হওয়া সম্ভব,—তারই স্তরবিভাগ করেছেন। সন্তান সেনাদলের এই প্রতিষ্ঠানটির পরিকল্পনায় যে অনন্যতা, দূরদর্শিতা ও কল্পনাশক্তির পরিচয় দিয়েছিলেন বঙ্কিমচন্দ্র বাংলাসাহিত্যে তা তুলনারহিত। সংগঠক বঙ্কিমচন্দ্রকে আবিষ্কার করতে গেলে 'আনন্দমঠ' ও 'দেবী—চৌধুরাণীর' এ সব অংশগুলির সাহায্য নিতে হবে। শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় এ প্রসঙ্গে যথার্থই বলেছেন,—

সন্তান সম্প্রদায়ের গঠনের মূলে যে আশ্চর্য দেশপ্রীতি, উন্নত আদর্শবাদ, রাজনৈতিক দূরদর্শিতা ও প্রলোভনজয়ী নিঃস্বার্থতার পরিচয় পাওয়া যায় তাহা সেকালের কেন, একালের আদর্শকেও অনেকদূর ছাড়াইয়া গিয়াছে।"[২১]

'আনন্দমঠ' রচিত হওয়ার অল্পকালের মধ্যেই বহু সংগঠন সংবাদ জাতীয় আন্দোলন ইতিহাসে পাওয়া যায়,—তা যে অল্পবিস্তর বঙ্কিমচন্দ্রের আদর্শবাদ প্রভাবিত তাতে সন্দেহ নেই। এই সম্প্রদায়ের সদস্যরাই 'আনন্দমঠকে' বেদবেদান্ত-গীতা-উপনিষদের মত পূজা করতে পেরেছিলেন। শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগল বলেছিলেন,

'বাঙ্গালীর জাতীয় জীবন সংগঠনে 'আনন্দমঠের' স্থান কত উচ্চ ও গভীর তাহা নির্ণয়ের সময় হয়ত এখনও আসে নাই। এক সময়ে স্বদেশকর্মীদের এক হাতে ছিল গীতা অন্য হাতে ছিল 'আনন্দমঠ'। যদিও গ্রন্থশেষে বিসর্জন আসিয়া প্র

২১. শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা, বঙ্কিমচন্দ্র ১৯৬৩।

লইয়া যায়, তথাপি আনন্দমঠের ভিতরকার ভাব ব্যঞ্জনা তথা সন্ন্যাসী সন্তানসম্প্রদায়ের নিষ্কাম স্বদেশপ্রেম বাঙ্গালী যুবকদের প্রাণে স্বদেশভক্তির সঙ্গে সঙ্গে আশ্চর্য ত্যাগ ও সেবা ধর্মের উদ্রেক করিয়াছিল।' [ভূমিকা, বঙ্কিমরচনাবলী, যোগেশচন্দ্র বাগল]

'আনন্দমঠের' ঐতিহাসিকত্ব সমালোচনার বিষয় হলেও রাজনৈতিক চেতনাকে নতুন করে জাগাতে পেরেছিল বলে গ্রন্থটি জাতীয়তার দিক থেকে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। 'আনন্দমঠের' প্রথমেই যে ভয়াবহ দুর্ভিক্ষের নিখুঁত বর্ণনা দিয়েছেন বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর পটভূমিকায় সন্তানসেনার আত্মদানের মহান ব্রতের প্রসঙ্গটি উজ্জ্বল হয়েছে। 'আনন্দমঠে' বিদ্রোহের যে চিত্র পাই—ইতিহাসে ঠিক সেই উদ্দেশ্য-প্রণোদিত বিদ্রোহের প্রসঙ্গ নেই, কিন্তু ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ যে সমগ্র বাংলাকে গ্রাস করেছিল, সে কথা ঐতিহাসিক। বাংলার সে দুর্দিনের চিত্র রচনা করেছেন তিনি পরম সহানুভূতির সঙ্গে,—

"১১৭৬ সালে বাঙ্গালা প্রদেশ ইংরেজের শাসনাধীন হয় নাই। ইংরেজ তখন বাঙ্গালার দেওয়ান। তাঁহারা খাজনার টাকা আদায় করিয়া লন, কিন্তু তখন বাঙ্গালীর প্রাণসম্পত্তি প্রভৃতি রক্ষণাবেক্ষণের ভার লয়েন নাই। তখন টাকা লইবার ভার ইংরেজের, আর প্রাণ সম্পত্তি রক্ষণাবেক্ষণের ভার পাপিষ্ঠ নরাধম বিশ্বাসহন্তা মনুষ্য কুলকলঙ্ক মীরজাফরের উপর। মীরজাফর আত্মরক্ষায় অক্ষম, বাংলা রক্ষা করিবে কি প্রকারে? মীরজাফর গুলি খায় ও ঘুমায়। ইংরেজ টাকা আদায় করে ও ডেসপাচ লেখে। বাঙ্গালী কাঁদে আর উৎসন্ন যায়। [১ম খণ্ড, ৭ম পরিচ্ছেদ]

এ বর্ণনায় ঐতিহাসিকত্ব আছে পুরোমাত্রায়। হতভাগ্য বাংলাদেশে সেদিন সত্যিকারের কোন সংগঠন ছিল না। মীরজাফরের নিষ্ঠুরতা আর স্বার্থান্ধতায় শাসক ইংরেজের অর্থলোলুপতার চাপে বাঙ্গালী যেদিন শুধুই নিষ্পেষিত, সেই ভয়াবহ শ্মশানের পটভূমিকায় একদল দেশসাধককে উপস্থাপিত করলেন বঙ্কিমচন্দ্র। এই কল্পনায় যে অসাধারণত্ব রয়েছে দেশপ্রেমিক বঙ্কিমচন্দ্রের সাহিত্য ও সাধনার ইতিহাস আলোচনা করলেই তা স্পষ্ট হবে। সন্ন্যাসী বিদ্রোহের সঙ্গে সন্তানসেনার দেশসাধনার পার্থক্য বঙ্কিমচন্দ্রেরই সুপরিকল্পিত সৃষ্টি। সন্ন্যাসীরা গৃহত্যাগী দস্যু, বঙ্কিমচন্দ্র গৃহী সন্তান সৃষ্টি করেছেন। বাংলার ঘরে ঘরে যখন হাহাকার, শুধু দু'একজন গৃহত্যাগী মহাপুরুষের মহানুভবতায় তা দূর করা সম্ভব নয়। সমগ্র বাংলা জুড়ে যে ভয়াবহ তাণ্ডব চলছে—তা অপসারণ করতে হলে ঘরে ঘরে বিপ্লবীর আবির্ভাব হওয়া দরকার। দেশব্রতসাধনের জন্য ব্যক্তিস্বার্থকে ভুলতে হবে, দেশের শান্তি ফিরিয়ে আনার জন্য ভোগ-সুখ-বিলাস বর্জন করতে হবে, সংঘবদ্ধ হতে হবে। এই মহামন্ত্রের প্রয়োগ ক্ষেত্র হিসেবে বাংলার অতীত ইতিহাস বেছে নিলেও উনবিংশ

শতাব্দীর উত্তেজনার মাটিতেই যে এ বীজ বপন সম্ভব—বঙ্কিমচন্দ্র এ কথা জানতেন।

আনন্দমঠেই প্রথম একটি সুপরিকল্পিত সশস্ত্র বিদ্রোহের নিখুঁত পরিকল্পনা রচনা করেছিলেন বঙ্কিমচন্দ্র। ইতিপূর্বে জাতীয় চেতনায় বিদ্রোহের উত্তেজনা এমন ভাবে কোনও রচনায় প্রতিবিম্বিত হয়নি। সশস্ত্র বিদ্রোহ করাই সন্তানসেনার উদ্দেশ্য, প্রয়োজন হলে শত্রুনিধন ও বলপ্রয়োগ করার নির্দেশ পেয়েছে তারা। সত্যানন্দ মহেন্দ্রকে সন্তান ব্রতে দীক্ষিত করার পর অস্ত্রশস্ত্র প্রস্তুতের নির্দেশ দিয়েছিলেন। সন্তানসেনার দীক্ষা শক্তিরূপিনী দেশমাতৃকার কাছে। বাঙ্গালীর বাহুবলের অভাবের অন্যতম কারণ এদেশে চৈতন্যপ্রবর্তিত প্রেমধর্মের প্রাবল্য, এ বিষয়টি স্পষ্ট করেছিলেন বঙ্কিমচন্দ্রই। "চৈতন্যদেবের বিষ্ণু প্রেমময়—কিন্তু ভগবান কেবল প্রেমময় নহেন—তিনি অনন্ত শক্তিময়। চৈতন্যদেবের বিষ্ণু শুধু প্রেমময় সন্তানের বিষ্ণু শুধু শক্তিময়।"

[দ্বিতীয় খণ্ড, চতুর্থ পরিচ্ছেদ]

শক্তিসাধনার এমন একটি সুপরিকল্পিত পন্থা স্বদেশপ্রেমিক বঙ্কিমচন্দ্র বাঙ্গালীর সামনে তুলে ধরেছিলেন অনেক আশা করেই। তাঁর আশা যে ব্যর্থ হয়নি পরবর্তী কালের স্বাধীনতা আন্দোলনের ইতিহাসই সে কথা প্রমাণ করবে। ইংরেজের বিরুদ্ধে সশস্ত্র অভ্যুত্থানের খসড়া রচনা করে বঙ্কিমচন্দ্র জাতির অশেষ কৃতজ্ঞতা লাভ করেছিলেন। লেখনী চালনা করেই তিনি পরোক্ষভাবে অসংখ্য সশস্ত্র বিপ্লবীদেরই চালনা করেছিলেন—একথা সত্য।

আনন্দমঠের সংগঠক পরিচালক সত্যানন্দ অরাজক বাংলায় সাময়িক শান্তি স্থাপিত হতে দেখেও তৃপ্ত হননি। শান্তি স্থাপন ও স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠা পৃথক বস্তু। পরাধীন জাতির জীবনেও শান্তির স্পর্শ লাগে—যদি স্বাধীনতার চেতনা তাদের বিব্রত না করে। সুশাসন বিদেশী বা স্বদেশী যে কোন যোগ্য শাসকেরই ব্যক্তিগত দক্ষতার ফল। 'আনন্দমঠে' শান্তি প্রতিষ্ঠার আয়োজন করেছিল সন্তান সম্প্রদায়, শান্তি প্রতিষ্ঠারও পরে সত্যানন্দ মহাক্ষোভ প্রকাশ করেছিলেন,

সত্যানন্দের দুইচক্ষে জলধারা বহিতে লাগিল। তিনি উপবিষ্টিতা, মাতৃরূপা জন্মভূমি প্রতিমার দিকে ফিরিয়া জোড়হাতে বাষ্পনিরুদ্ধস্বরে বলিতে লাগিলেন, "হায় মা! তোমার উদ্ধার করিতে পারিলাম না—আবার তুমি ম্লেচ্ছের হাতে পড়িবে। সন্তানের অপরাধ লইও না। হায় মা! কেন আজ রণক্ষেত্রে আমার মৃত্যু হইল না।"

[চতুর্থ খণ্ড, অষ্টম পরিচ্ছেদ]

সত্যানন্দ তবে কি চেয়েছিলেন? ইংরেজের শাসন যে ফলপ্রদ হবে—সে কথা জানার পরেও,

"সত্যানন্দের চক্ষু হইতে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ নির্গত হইল। তিনি বলিলেন—'শত্রুশোণিতে সিক্ত করিয়া মাতাকে শস্যশালিনী করিব।" [ঐ]

এ সত্যানন্দের সত্যিকারের আদর্শ কারোর অজানা থাকে না। বঙ্কিমচন্দ্র ইংরেজ শাসনের সুফলের কথা যত সাড়ম্বরেই বলুন না কেন—আনন্দমঠের সর্বত্যাগী সন্ন্যাসীর দায়িত্ব কি ফুরিয়ে গেছে? তবে সত্যানন্দের চক্ষে অগ্নিস্ফুলিঙ্গের কথা বললেন কেন লেখক? এই সত্যানন্দের যে পরিচয় সমগ্র 'আনন্দমঠে' বিবৃত হয়েছে—তার সঙ্গে উপন্যাসের শেষাংশের সত্যানন্দকে ঠিক মেলানো যায় না। যিনি সমস্ত সন্তানসেনাকে নিপুণভাবে পরিচালনা করেছিলেন, সন্তানসেনার ঈপ্সিত শান্তি প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পরেও তিনি বিক্ষুব্ধচিত্তে স্বীয় প্রাণ হনন করতে চেয়েছিলেন কেন? বঙ্কিমচন্দ্র এই বিক্ষুব্ধ, উত্তেজিত, আত্মবিস্মৃত সংগঠককে শেষ পর্যন্ত শান্ত করতে পারেননি। মহাপুরুষ তাঁকে হিমালয়ের মাতৃমন্দিরে নিয়ে গেলেন বটে, কিন্তু সত্যানন্দ যেতে চাননি,—তাঁর কর্তব্য সম্পন্ন হয়েছে বলে বঙ্কিমচন্দ্রও মনে করেননি। 'আনন্দমঠের' পরিচালক সত্যানন্দের চরিত্রের মাধ্যমেই বঙ্কিমচন্দ্র দেশপ্রেমের ইঙ্গিতপূর্ণ বাণী প্রচার করেছেন।

সন্তানসেনার দেশব্রতের মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল অরাজকতা দমন করা, কিন্তু স্পষ্টভাবে না বললেও দেশোদ্ধারের আদর্শটি তার মধ্যেই নিহিত ছিল। সত্যানন্দের কণ্ঠে সেই বাণী বহুভাবে ধ্বনিত হয়েছে,—ভবানন্দের আবেগে এই বক্তব্যই স্পষ্ট হয়েছে বারবার। সত্যানন্দ যে পথে সন্তানসেনাকে চালিত করেছিলেন বাহুবলে, ধৈর্যে, সংযমে, নিষ্ঠায়, ধর্মবিশ্বাসে সেপথটি দেশসেবার ও দেশোদ্ধারের উৎকৃষ্ট পন্থা বলে বিবেচিত হতে পারে। দেশপ্রেমিকের কর্তব্য কি, সেকথা বিশ্লেষণের পরেই দেশপ্রেমিকের জীবন্ত বিগ্রহটিকে বঙ্কিমচন্দ্র এমন অপরূপ উপায়ে আমাদের সামনে এনেছেন। কোন সমালোচক বঙ্কিমচন্দ্রের উদ্দেশ্য ব্যাখ্যায় বলেছেন,—

"তাঁহার আনন্দমঠের শেষ দৃশ্যে বিসর্জন আসিয়া প্রতিষ্ঠাকে লইয়া গিয়াছে। তথাপি স্বাধীন হইবার এই প্রবৃত্তি তিনি কখনই পরিত্যাগ করেন নাই এবং এই কারণেই 'আনন্দমঠের' সন্ন্যাসীরা মৃত্যুপণ করিয়াছিল।—আনন্দমঠের সন্তান সম্প্রদায় বঙ্গজননীর এই লুপ্ত স্বাধীনতা ফিরাইয়া আনিবার সাধনা করিয়াছিলেন, কিন্তু বঙ্কিম স্বীয় অপরিসীম প্রবৃত্তি সত্ত্বেও তাঁহাদিগকে বিজয়গৌরব দিতে পারেন নাই। আনন্দমঠের ট্রাজিডি ইহাই।"[২২]—উনবিংশ শতাব্দীতে বাঙালীর অন্তর এমন একটি আদর্শ নেতাকেই খুঁজে বেড়াচ্ছিল। কিন্তু স্রষ্টার কল্পনাতেই তার জন্ম

২২. সজনীকান্ত দাস, বঙ্কিম সাহিত্যের ভূমিকা, সীতারাম। পৃঃ ৮৬।